যেদিন ফুটলো কমল

উপন্যাস

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

প্রকাশক
শ্রীশ্যামসুন্দর মজুমদার
৫০।৭ বি, হরিশ মুখার্জি রোড্
কলিকাতা

"অবসর প্রেস"
মুদ্রাকর—শ্রীমহেশচন্দ্র পাত্র
৩৪ কালী দত্তের ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—অগস্ট্, ১৯৩৩

দাম দুই টাকা

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

ক বি তা

বন্দীর বন্দনা

পৃথিবীর পথে

ছো ট গ ল্প

অভিনয়, অভিনয় নয়

রেখাচিত্র

অদৃশ্য শত্রু

নতুন নেশা

উ প ন্যা স

সাড়া

অকর্ম্মণ্য

মন-দেয়া-নেয়া

যবনিকা-পতন

সানন্দা

রডোডেনড্রন-গুচ্ছ

আমার বন্ধু

যেদিন ফুট্‌লো কমল

হে বিজয় বীর

ছে লে দে র

রঙিন কাচ

ঘুম-পাড়ানি

এলোমেলো

পার্থপ্রতিম

পরীক্ষায় যে-সব ছেলে পয়লা নম্বর, তাদের প্রতি পার্থপ্রতিমের অবজ্ঞার সীমা ছিলো না। অনার্স্‌কোর্সের দৌড়ে ঘাড় নুইয়ে ছুটে-ছুটে মুখে ফেনা তুলে গেজেটের সবার উপরকার লাইনে যা'রা হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে; নোট মুখস্থ করে', কেতাবগুলোকে রঙিন পেন্সিলে চিত্রিত করে', অকারণ, অবান্তর ও শ্রুতিগম্ভীর বিবিধ জটিল প্রশ্নে অধ্যাপকদের শান্তির জীবন বিষাক্ত করে' তুলে, লাইব্রেরির দুরূহ শেল্‌ফ্‌স্থিত অনেক বিস্মৃত ও অস্পৃষ্ট বইয়ের অর্দ্ধ-শতাব্দীর ধূলিময় স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে যা'রা মরি-বাঁচি করে' সেনেট-হলের খেলায় সব চেয়ে উঁচু লাফ দেয়, তা'রা—পার্থপ্রতিমের মতে—হচ্ছে গিয়ে একরকমের জীব যাদের সম্বন্ধে যত কম বলা হয়, ততই তাদের পক্ষে ভালো। তা'রা তর্ক করবে, কী-কী কারণে কীট্‌স্‌ sensuous হ'লেও sensual নন্‌; রোমান্টিসিজ্‌ম্‌-এর স্রোত জর্ম্মানিতে আরম্ভ হ'য়ে কোন্‌-কোন্‌ রাস্তায় ইংলণ্ডে এসে পৌঁছলো

এবং কোথায় ঠিক কতখানি মোড় বেঁক্‌লো, তা'রা তা'র ম্যাপ এঁকে দিতে পারে; রাজা আর্থারের উদ্ভব প্রথমে ইংলণ্ডের মাটিতে না ফ্রান্সের, এ নিয়ে তা'রা অনায়াসে চার খাতা ভর্ত্তি বাঙালি-ইংরিজি লিখে ফেল্‌তে পারে; কোন্ গভীর দর্শনের বিচারে সত্যই সৌন্দর্য্য আর সৌন্দর্য্যই সত্য, ইংরেজ কবির এ-উক্তি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হ'য়ে গেছে, সে-সব সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা তাদের নখদর্পণে। মোটের উপর, তা'রা খেটেছে ঢের; এবং প্রতি পদে তা'রা প্রমাণ কর্‌বার জন্য উৎসুক যে তা'রা খেটেছে। অনেক কষ্টে তা'রা বিদ্যে বয়ে' বেড়ায়, যতক্ষণ না পরীক্ষার খাতায় তা'র যতখানি সম্ভব বমি করে' ফেল্‌তে পারে। বিদ্যে যেন তাদের সর্ব্বাঙ্গে ফুটে রয়েছে পাঁচড়ার মত, তাদের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়। ও-সব ছেলেই বাৎসরিক বিজয়ের নিশান উড়িয়ে বেরোয় কলেজ থেকে, পরে ঢোকে সরকারি চাক্‌রিতে, তাদের পালায় করে অধ্যাপনা। তাদেরই জন্য দেশের অবিবাহিত মেয়ের মা-রা সব ক্ষেপে যান্, এবং তাদের কারু বিয়ে হ'য়ে গেলে অনেক মা শোকে শয্যাগ্রহণ করেন। তা'রাই হ'য়ে ওঠে যাদেরকে বলা হয় দেশের মধ্যে গণ্যমান্য। কিন্তু তাদের কারু সঙ্গে পাঁচ মিনিট আলাপ করুন্, আপনার হাড়গোড় পর্য্যন্ত

ক্লান্ত হ'য়ে পড়্বে। এমন রন্ধ্রহীন নির্ব্বুদ্ধিতা, আপনার ইচ্ছে কর্বে সেখানে কপাল ঠুকে মর্তে। পেশাদার পাশ-দেনে-ওয়ালা, পরীক্ষা পাশ করা ছাড়া আর-কিছুরই এরা উপযুক্ত নয়। এদের সঙ্গে আলাপ কর্বার চাইতে সতেরোর ঘরের নাম্তা মুখস্থ করা অনেক বেশি উপভোগ্য।

এ-সব মন্তব্যই অবিশ্যি পার্থপ্রতিমের, আমি উদ্ধৃত কর্ছি মাত্র। পাশ-দেনে-ওয়ালাদের সম্বন্ধে পার্থপ্রতিম আরো নানারকম সব কড়া কথা বল্তো, সেগুলো আমি এখানে লিখ্তে সাহস কর্লুম না। কোনোরকম অছিলা পেলেই এই 'জীববিশেষে'র উদ্দেশ্যে খোঁচা দিতে সে ছাড়্তো না। বাড়াবাড়ি, নিশ্চয়ই। আমারও তা-ই মনে হ'তো। ওর এ-সব কথার পিছনে আছে মনের একটা আক্রোশ, বাঙ্লা ভাষায় যাকে বলে ঝাল। থাক্তেই পার্তো; কারণ, ওর ক্লান্তিহীন বিদ্রূপের যা'রা বিষয়, পার্থপ্রতিম নিজেও ছিলো তাদেরই একজন। বরাবর পরীক্ষায় সে পয়লা নম্বর। এবং এই চিন্তা তা'র কাছে ছিলো বিষের মত। পরীক্ষায় প্রথম হবার মত এমন একটা সাধারণ ব্যাপার পড়েছে তা'র ভাগ্যে, এ-কথা ভাব্তে সে সহ্য কর্তে পার্তো না। আর তাই, সে প্রতিহিংসা নিতো পাশ-দেনে-ওয়ালা অত্যন্ত

নিরীহ, অত্যন্ত অমায়িক ছেলেদের উপর : যে-জ্বালা তা'র নিজের জন্য, তা মেটাতো তাদের উপর দিয়ে। কেউ যদি কখনো তা'র কালেজি কৃতিত্বের সপ্রশংস উল্লেখ করতো, সে এমনভাবে জ্বলে' উঠ্তো, যেন তা'কে অপমান করা হয়েছে। অপমানই তো, সে মুখে না হোক্ মনে-মনে বল্তো, পরীক্ষার নম্বর নিয়ে আমাকে বাহবা দিতে আসা অপমান ছাড়া আর কী? 'আমি যদি পরীক্ষায় ভালো করে' থাকি,' সে বল্তো, 'সে কি আমার দোষ? আমি ভালো করেছি—ইচ্ছে করে' নয়, চেষ্টা করে' নয়, না করে' পারি নি বলে'। যা হয়েছে, তা না-হওয়া অসম্ভব ছিলো; কারণ আমি যা, আমি তা-ই।' এমন বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের সুরে বল্তো যে রাগ হ'তো শুনলে; কিন্তু সে-রাগটা মনে-মনে হজম করে' ফেলা ছাড়া উপায় থাক্তো না, কারণ সে যা বলছে, তা যে সত্যি তা সবাই জান্তো। পার্থপ্রতিম ফিললজির ক্লাশে বসে' নিতান্ত প্রকাশ্যভাবে নভেল পড়্তো; টিউটরিয়ল একমাস বাকি ফেলে হঠাৎ ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজে দু'পাতা লিখে এনে দাখিল কর্তো; পি-এইচ্-ডি অধ্যাপক যখন শেলির বিশ্বমানবতা সম্বন্ধে বক্তৃতা কর্তেন, মুখের এমন ক্লিষ্ট চেহারা করে' তাঁর দিকে তাকিয়ে থাক্তো, যেন কেউ তা'কে মার্ছে।

উইলিয়ম মরিস্ বল্‌তেন, যে-লোক তাঁত বুন্‌তে-বুন্‌তে মহাকাব্য লিখে ফেল্‌তে না পারে, সে আবার কবি কিসের?' তেম্‌নি পার্থপ্রতিম বল্‌তো: 'কোনোরকম দুর্ভাবনা না করে', দিব্যি আরামে বসে' থেকেই যদি পরীক্ষায় ভালো করা না গেলো, তা হ'লে সে-ভালো-করার মানে কী?' তা'র কথায় বেশ একটু অহঙ্কার ছিলো; বস্তুত—আপনারা অবিশ্যি তা এতক্ষণে টের পেয়ে গেছেন—তা'র মনে নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট গর্ব্ব ছিলো—বড় বেশি গর্ব্ব, সবাই বল্‌তো। থাক্‌তেই পারে; গর্ব্ব কর্‌বার কারণ থাক্‌লে কে না গর্ব্ব করে? ক্লাশের ছেলেদের সে আমলের মধ্যেই আন্‌তো না; সারা বছর ভরে' সে তাদের সঙ্গে সবসুদ্ধ পাঁচটা কথা বল্‌তো কিনা, সন্দেহ। প্রতিদিন বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে' তা'দের নামও সে ভালো করে' জান্‌তো না। ছেলেদের আড্ডায়, সভায়, ক্লাবে তা'কে কখনো দেখা যেতো না; রাস্তায় কোনো সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হ'লে সে তাড়াতাড়ি একটু পরিচয়সূচক মাথা নুইয়েই সরে' যেতো। এবং অধ্যাপকদের সম্বন্ধে সে নাকি রোজ এই বলে' ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্‌তো, 'প্রভু, এদের ক্ষমা করো; এরা জানে না, এরা কী কর্‌ছে।'

পার্থপ্রতিমের ধারণা ছিলো, সে কলেজে পড়্তে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি নিছক একটা দয়া কর্‌ছে। পয়লা নম্বরটা তা'র পক্ষে কিছু সম্মানই নয়—এর চাইতে অনেক বড় জিনিসের জন্য সে উদ্দিষ্ট। বরং, কালেজি শিক্ষার অন্ধ, মন্থর রুটিন-পরিক্রমণ তা'র পক্ষে—যেমন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষেই তা হ'তে বাধ্য—একটা বিষম শাস্তি। 'আমি হচ্ছি', সে হেসে বল্‌তো, 'বর্ত্তমান বাঙ্‌লার একমাত্র লোক, বুদ্ধিমান হ'য়েও যে পরীক্ষায় ভালো করেছে, এবং পরীক্ষায় ভালো করে'ও যা'র বুদ্ধি লোপ পায় নি।' 'আমাকে দিয়ে পরীক্ষা পাশ করানো', একটা অত্যন্ত 'কাব্যিক' উপমা দিয়ে সে আরো বল্‌তো, 'আর চাঁদের টুক্‌রো দিয়ে আংটি গড়ানো একই কথা।' তা'র এ-উক্তির মানে এই যে চাঁদের টুক্‌রো ভেঙে আংটি গড়ানো যদি সম্ভব হ'তো, আংটিটে খুবই সুন্দর হ'তো, সন্দেহ নেই; কিন্তু চাঁদের পক্ষে সেটা চরম চন্দ্রত্ব হ'তো না। তেম্‌নি তা'কে পাশ কর্‌তে দিলে ফল যে ভালো হবে, তা তো জানা কথাই; কিন্তু তা'র পক্ষে সে-ভালো কিছু ভালো নয়, সেটা কিছুই নয়। সেখানে তা'র কোনো প্রকাশ নেই। এরই নাম অপব্যবহার। যে যা সব চেয়ে বেশি দিতে পারে, সে যেন তা-ই

দেয়। তা'র চেয়ে ছোট কোনো ব্যবহারে তা'কে লাগানো—তা-ও একরকমের অত্যাচার।

পার্থপ্রতিম যে এ-সব কথা মনে কর্‌তো এবং বল্‌তো, তা'র কারণ সে লিখ্‌তে পার্‌তো। লিখ্‌তে অবিশ্যি আমরা সবাই পারি; 'পত্রপাঠমাত্র অবিশ্যি তিরিশ টাকা পাঠাবেন, বিশেষ দরকার' এই বলে' বাপকে, কি 'তুমি চলে' যাবার পর সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার ঠেক্‌ছে' এই বলে' স্ত্রীকে কে না চিঠি লিখেছে? কিন্তু পার্থপ্রতিম তা'র চেয়ে বেশি পার্‌তো: সে তা'র মনের কথা স্পষ্ট করে' বল্‌তে পার্‌তো। বড় সহজ হ'য়ে গেলো শুন্‌তে; আপনি হয়-তো ভাব্‌ছেন, তা তো আমিও পারি। বেশ, কাগজ-কলম নিয়ে একবার চেষ্টা করে' দেখুন। ভাব্‌তে যা সব চেয়ে সহজ, প্রকাশ কব্‌তে তা-ই সব চেয়ে শক্ত। সেখানেই দেখ্‌বেন, কথা নেই। না, আপনি মাথা খুঁড়ে মর্‌লেও কথা খুঁজে পাবেন না; কিন্তু অন্য-একজন, দেখ্‌বেন, ঠিক আপনারই মনের কথা অনেক আগেই লিখে রেখেছে—লিখেছে সহজ করে', এবং তা'র চেয়েও যা বেশি, সুন্দর করে'। আপনার মনে যে ঠিক ঐ কথাই ছিলো, তা আপনি স্পষ্ট করে' বুঝ্‌তে পার্‌লেন অন্য-একজনের সেই লেখা পড়ে'। এরই নাম কথার ভোজবাজি, অর্থাৎ আর্ট।

পার্থপ্রতিম, তা হ'লে, লিখ্‌তে পার্‌তো, এবং লিখ্‌তোও—অজস্র। যখন তা'র খুসি, যেমন তা'র মর্জি—নিতান্ত নিজেরই গরজে। নিজেরই খুসির জন্য। যেন নতুন একরকমের খেলা, যা'র সব চেয়ে মজা এ-ই যে তা'তে ক্লান্তি নেই; যত পুরানো হয়, মজা ততই ঘোরালো হ'য়ে আসে। স্রোতের জলের মত অজস্র সব লেখা, বয়ে' চলেছে অবাধ—দায়িত্বের ভার নেই, কোনো উদ্দেশ্যের পিছুটান নেই—মুহূর্ত্তের অস্তিত্বে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ, ঢেউয়ের পরে ঢেউ ভেঙে পড়্‌ছে সূর্য্যের আলোয় রামধনু-ঝলকে। পার্থপ্রতিমের মগজের কোষে-কোষে অগুন্‌তি ভাবনা ঠাসাঠাসি করে' আছে, ঠেলাঠেলি কর্‌ছে বেরিয়ে আস্‌বার জন্য—হাঁফ ধরে' যায়, কোন্‌টাকে ফেলে কোন্‌টাকে নেবে। তা'র মনের মধ্যে কত সময় কত কথা হঠাৎ জ্বলে' ওঠে আলোর মত—দিশে পায় না, এত আলো নিয়ে সে কী কর্‌বে। মনে-মনে বলে: দিলে যদি, এত অজস্র দিলে কেন; আর এত অজস্রই যদি দিলে, সে-অনুপাতে শক্তি কেন দিলে না, যাতে সব ব্যবহার কর্‌তে পারি। অনেক ভাবনা অবিশ্যি মগজের মধ্যেই স্রেফ ভিড়ের চাপে মারা যায়; অনেক কথা যায় মনের মধ্যেই নিবে। কিন্তু সে-জন্য পার্থপ্রতিম এক মুহূর্ত্তও

আক্ষেপ করে না; খোয়াতে-খোয়াতে, হারাতে-হারাতে, ছড়াতে-ছড়াতে সে চলে' যায় নতুন থেকে নতুনতরোতে। যতক্ষণ একটা জিনিস লেখা হ'তে থাকে, ততক্ষণই মজা; যে-মুহূর্ত্তে লেখা শেষ হ'লো, সে-মুহূর্ত্তেই সেটা শেষ হ'য়ে গেলো, পার্থপ্রতিম সেটাকে ভুলে' যায়, তা'র মন ছোটে এর পরে যেটা আস্‌বে, তা'র প্রতি। নিজের লেখার মায়ায় সে কখনো জড়িয়ে পড়ে না; জিনিসটা কেমন হ'লো, তা একটু তাকিয়ে দেখ্‌বার তা'র সময় নেই। লেখা যে হয়েছে, সেটাই ঢের, সেটাই সবখানি। সেইটুকু খেলার মজা। তা'র সব লেখা সে বেহিসেবি নির্ভাবনায় ছড়িয়ে দেয়, উড়িয়ে দেয়—কিছু হয়-তো ছাপা হয় মাসিকপত্রে, কিছু পড়ে' থাকে টেবিলের দেরাজে—একদিন হয়-তো দেখা গেলো, জায়গার টানাটানি হচ্ছে—তখন ফেলে' দিলে ছিঁড়ে। না-হয় খেয়াল হ'লো, পাঠিয়ে দিলে কতগুলো লেখা দূর শহরের বাসিন্দা কোনো বন্ধুর কাছে। তা'র লেখার পাঠকচক্র ছিলো তা'রই দু'চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে আবদ্ধ; তাদের কাছে সে কখনো মত জিজ্ঞেস কর্‌তো না, গায়ে পড়ে' তাদের কেউ প্রশংসা কর্‌লে স্পষ্টত খুসি হ'তো, নিন্দে কর্‌লে থাক্‌তো চুপ করে'। মোটের উপর, ও-সব ভালো করে' তা'র

গায়েই লাগ্‌তো না। বন্ধুরা সন্দেহ কর্‌তো, লেখা-সম্বন্ধে সে মোটেও সীরিয়াস্‌ নয়। 'তা তো নই-ই', সে বল্‌তো, 'যেটা মজার ব্যাপার, সেটাকে যদি ভাবনার বিষয় করে' তুলি, তা হ'লেই তো সেটাকে খুন কর্‌লুম।' আরো বল্‌তো, 'লেখাটা ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তা'তে এসে যায় না, কিছু-একটা যে হ'য়ে উঠ্‌তে পেরেছে, সেটাই আসল কথা।' 'হয়-তো,' একদিন ও আমাকে বলে' ফেলেছিলো, 'এই লেখার ভিতর দিয়ে আমিও হ'য়ে উঠ্‌ছি।' আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'কী হ'য়ে উঠ্‌ছো?' 'কী আবার। আমি আমিই হ'য়ে উঠ্‌ছি।'

শ্রীলতা

পার্থপ্রতিম যখন এম্‌-এ পড়ে, তা'র সঙ্গে এসে ভর্ত্তি হ'লো শ্রীলতা দত্ত নামের এক মেয়ে। লোরেটোয় ভর্ত্তি হবার আগে কোন্‌ শৈল-শহরের এক কন্‌ভেণ্টে সে পড়েছিলো। গুজব শোনা গেলো, ইংরিজিতে সে আগুন। সবার মনেই বিদ্যুতের মত এ-কথাটা একবার খেলে' গেলো—এবার যদি পার্থপ্রতিম একটা হার খায়।

শ্রীলতা যে সঙ্গতিপন্ন ঘরের মেয়ে, তা তা'র শাড়ি-গুলোর অফুরন্ত বৈচিত্র্য থেকেই অনুমান করা যেতো। শোনা গেলো, কল্‌কাতায় সে থাকে তা'র দাদার সঙ্গে, যিনি এক বিলিতি বীমা-কোম্পানির হোম্‌রা গোছের কেরানি। উৎসাহী ছেলেরা রিচি রোডে তাদের বাড়ির নম্বরটা পর্য্যন্ত আবিষ্কার করে' ফেল্‌লে। কিছুদিন পর্য্যন্ত, শ্রীলতা দত্ত সম্বন্ধে নানারকম গল্পে ও প্রবাদে, তথ্যে ও রূপকথায় ইউনিভার্সিটির আবহাওয়া চঞ্চলিত, মর্ম্মরিত, তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

শ্রীলতার গড়ন ছিপছিপে লম্বা—পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে আঁটো করে' শাড়ি পর্‌বার জন্য যতটা নয়, তা'র চেয়েও লম্বা দেখাতো। তা'র উজ্জ্বল-কালো চুল ঠিক মাঝ-খানে ভাগ করে' সে দু'দিকে টান করে' নামিয়ে দিতো; আর সেই কালো চুলের নিচে তা'র ফর্সা মুখ দেখাতো আশ্চর্য্যরকম ম্লান। আর সেই তা'র ম্লান মুখে, ঠোঁটের ঠিক নিচে ছিলো ছোট, কালো একটা তিল—এমন মানানসইভাবে বসানো যে ছেলেরা প্রথমটায় সন্দেহ করেছিলো যে সেটা তুলিকৃত। কিন্তু দিনের পর দিন ভালো করে' লক্ষ্য করে' দেখা গেলো যে সেই তিলের উপর শ্রীলতার নিজের কোনো হাত নেই। অনেক তর্ক, অনেক গবেষণা তা নিয়ে ছেলে-

দের মধ্যে। বস্তুত, যে-কোনো লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিলো ঐ তিল লক্ষ্য না-করা। শ্রীলতার বহিরাকৃতির ওটাই ছিলো প্রধান বিশেষত্ব।

এমন নয় যে সে ছিলো আমরা যাকে বলি সুন্দর। তবে তা'র কতগুলো রকম ছিলো—খানিকটা স্বাভাবিক, খানিকটা হয়-তো মেমি ইস্কুল থেকে অর্জ্জিত। সে কখনো ঋজুরেখায় হাঁট্‌তো না; তা'র পদক্ষেপের উপর দিয়ে খড়ি বুলিয়ে গেলে দেখা যেতো, তা একটা দীর্ঘ কর্ক্-স্ক্রুর আকৃতি নিয়েছে। চল্‌তে-চল্‌তে কারো সঙ্গে দেখা হ'লে সে তা'র খুব কাছে এসে পড়ে' হঠাৎ থেমে যেতো; থাম্‌তে গিয়ে শরীরের উপরকার অংশ পিছন দিকে ঈষৎ হেলিয়ে দিতো। আর সে কতগুলো কাজ কর্‌তো, বাঙালি মেয়েরা সাধারণত যা করে না: সে স্পষ্ট উচ্চারণ করে' মুক্তকণ্ঠে কথা কইতো, হাস্‌তো চেঁচিয়ে, হাঁট্‌বার সময় তাকাতো এপাশে-ওপাশে—নানাভাবে প্রকাশ কর্‌তো যে তা'র মনের চঞ্চলতা রাশ মান্‌তে চাইছে না। অন্যান্য মেয়েরা বল্‌তো, ঢঙ্! মেয়েলি ভাষায় যা'র মানে হচ্ছে গিয়ে ভাণ, দেখানোপনা। কিন্তু আমি জানি, দেখানোপনা শ্রীলতার এতটুকু ছিলো না: সে যা, সে তা-ই; তা'র আচরণ, ব্যবহার অন্য-

রকম হ'তে হ'লে তা'কে শ্রীলতা দত্ত না হ'য়ে অন্য-কেউ হ'তে হ'তো। আসল কথা, সে ছিলো প্রাণে পরিপূর্ণ; তা'র সমস্ত পাৎলা শরীর যেন প্রাণের একটা স্তম্ভ: সেই নিহিত প্রাণ এনে দিয়েছিলো দ্রুত ছন্দ তা'র জীবনে; তা'রই প্রেরণায় তা'র শরীরের প্রতি ছোট ভঙ্গী উজ্জীবিত, উদ্দীপিত; তা উপ্‌চে পড়্‌তো তা'র হাসিতে আর কথায়, ঢেউ খেলিয়ে যেতো তা'র চঞ্চলতায়। ও-সব জিনিসেই তা'র প্রকাশ। যেমন পার্থপ্রতিমের প্রকাশ তা'র অবাধ আর অজস্র লেখায়—স্রোতের জলের মত যা বয়ে' যাচ্ছে, ঝলোমলো কর্‌ছে মুহূর্ত্তের আলোয়, মিলিয়ে যাচ্ছে মুহূর্ত্ত-পরে রঙিন বিস্মৃতিতে। প্রাণ এক: তা'র প্রকাশ অনেক ও বিচিত্র।

স্বাভাবিক মাত্র, শ্রীলতা দত্তর আবির্ভাব যে ইউনিভার্সিটিতে একটা সাধারণ তোলপাড় তুল্‌বে। ঝড় উঠ্‌লো অনেক যুবকের মনে: তাদের মধ্যে যা'রা সাহসী, তা'রা এগিয়ে গেলো কোনো-একটা অছিলা করে' আলাপ কর্‌তে; আর যা'রা তা পার্‌লে না, তা'রা দূরে দাঁড়িয়ে পূর্ব্বোক্তদের উদ্দেশে প্রয়োগ কর্‌তে লাগ্‌লো নানারকম কটু ভাষা। তাদের আত্ম-সম্মানজ্ঞান হঠাৎ এমন টন্‌টনে হ'য়ে উঠ্‌লো যে

ছোঁয়া যায় না; আর শিভ্যল্‌রিতে তা'রা যেন প্রত্যেকেই এক-একটি স্যর গ্যালাহাড। 'কী বেহায়া! গায়ে পড়ে' গেছে আলাপ কর্‌তে।' 'ভদ্রমহিলার সম্মান জানে না।' 'মেয়েদের সঙ্গে কি ও-রকম ব্যবহার কর্‌তে হয়!' তাদের আহত ভদ্র আত্মার ন্যায়ানুপ্রেরিত উষ্মা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতো, যখন তা'রা দেখ্‌তো ভদ্রমহিলাটির মনে কিছুমাত্র বিকার নেই; নির্লজ্জ ছেলেদের দুঃসাহসে তিনি নিজকে বিপন্ন মনে করে' অদূরে অপেক্ষমান এবং লেশমাত্র অঙ্গুলি-হেলনে ছুটে-আস্‌তে-প্রস্তুত গ্যালাহাডদের সাহায্য প্রার্থনা কর্‌ছেন না। বস্তুত, শ্রীলতার সঙ্গে আলাপ করা ছিলো খুব সোজা—বড় বেশি সোজা, হয়-তো। কারণ, মেয়েরা যে নিজেদের চারদিকে একটা বেড়া দিয়ে রাখে, সেটাই তাদের আকর্ষণ, আমন্ত্রণ; যেখানে ভালো করে' আলো পড়ে না, সেই আবছায়াটুকুই তাদের মোহ। কিন্তু সেই বেড়া শ্রীলতার মনে হয় কোনোকালেই ছিলো না, না হয় সে তা ভেঙে দিয়েছিলো ইচ্ছে করে'। মোট কথা, নিজকে সে কোনোভাবেই ঢাকা দিয়ে রাখ্‌তো না কি রাখ্‌তে পার্‌তো না: স্পষ্ট আর উজ্জ্বল, তা'কে মনে হ'তো আগাগোড়া একটা ঝল্‌সানি। অবাধে সে হাস্‌তো আর কথা কইতো: তা'র খেয়াল

থাক্‌তো না, যা'র সঙ্গে কথা কইছে সে ছেলে না মেয়ে। পুরুষের চোখে যে তা'র বিশেষ-একটা রূপ, তা সে ভুলে' যেতো ; ভুলে' যেতো আব্রু টান্‌তে, থম্‌কে দাঁড়াতে। কোনো অবস্থাতেই নিজকে সে সাম্‌লাতে পার্‌তো না। ফোয়ারা মুখের জলধারার মত, তা'র প্রাণ অজস্র ঝরে' পড়্‌তো যা-কিছু হাতের কাছে আস্‌তো, তা'রই উপর ; মুহূর্ত্তের মৃত্যু পার হ'য়ে মুমূর্ষু পরমুহূর্ত্তের উপর।

এমন নয় যে পার্থপ্রতিমের মনেও ঢেউ গিয়ে না লেগেছিলো। প্রথম যেদিন সে শ্রীলতার উপর চোখ রাখ্‌লো, পার্থপ্রতিম যেন চম্‌কে উঠ্‌লো একটা ধাক্কা খেয়ে : যেমন আমরা চম্‌কে উঠি অন্যমনস্কভাবে অনেকক্ষণ ধরে' গলিঘুঁজি দিয়ে হাঁট্‌তে-হাঁট্‌তে হঠাৎ যখন এসে পড়ি বড় রাস্তায়, চেনা রাস্তা নতুন লাগে, মনে পড়ে' যায়, পার হ'তে হবে সাবধানে। পার্থপ্রতিম যেন এমন-একটা জিনিসের মুখোমুখি দাঁড়ালো, যা একেবারে নতুন, এমন আশ্চর্য্য যে ভাবা যায় না ; পৃথিবীতে যা'র অস্তিত্ব আছে বলে' সে কখনো সন্দেহ করে নি। তলিয়ে দেখ্‌তে গেলে, সে-জিনিস অবিশ্যি মেয়ের শরীর, মেয়ের শরীরের সৌন্দর্য্য। এখানে বলা দরকার, পার্থপ্রতিম তা'র একুশ বছরের জীবনের মধ্যে

কোনো মেয়ের সঙ্গে মেশে নি, সুযোগ পায় নি বলে' নয়, সময় হয় নি বলে'—বরং, খেয়াল হয় নি বলে'। পৃথিবীতে একজনমাত্র মেয়েকে সে অন্তরঙ্গভাবে জান্‌তো —সে-মেয়ে তা'র বিধবা মা। আর এই মা-কে সে ভালোবাস্‌তো রাক্ষসের মত—সে-ভালোবাসায় তা'র বুকের ভিতরটা টন্‌টন্‌ করে' উঠ্‌তো, সে-ভালোবাসার ধারে তা'র সমস্ত সত্তা যেন ক্ষয়ে' যেতো। এত তীব্র সে-ভালোবাসা, এক-এক রাত্রে বিছানায় শুয়ে তা'র কেমন ভয়-ভয় কর্‌তো—এ-ভার আমি বইবো কী করে'? তা নিঙ্‌ড়ে বা'র করে' নিতো তা'র সব, সব; আচ্ছন্ন করে' রাখ্‌তো তা'কে, তা'র সম্পূর্ণতাকে। অন্য-কোনো মেয়ে তা'র চোখেই পড়্‌তো না: কিম্বা শুধু চোখেই পড়্‌তো, দেখ্‌তে সে পেতো না। কখনো সে ভাবে নি অন্য-কোনো মেয়ের কথা, তা'র মন কখনো চায় নি অন্য-কোনো ভালোবাসা। এবং যা আমরা চাই নে, তা আমরা পেতেও পারি নে; কেননা, চাওয়াই হচ্ছে পাওয়ার প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত।

কিন্তু শ্রীলতাকে পার্থপ্রতিম যে-মুহূর্ত্তে দেখ্‌লো, তা'র মন আপনা থেকে বলে' উঠ্‌লো, 'বাঃ, কী সুন্দর!' হঠাৎ যেন সে জেগে উঠ্‌লো—এক নতুনত্বে, এক অভাবনীয়তায়। কী সুন্দর—এই বিস্ময়-ধ্বনি, তা শুধু

একটা খুচ্‌রো মন্তব্য নয়, তা একটা স্বীকার, পার্থপ্রতিমের অস্তিত্বের মধ্যে শ্রীলতারূপ সত্যের গ্রহণ। সে-উক্তি প্রকর্ষচিত্তের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ থেকে উৎসারিত নয়, তা উদ্ভূত পার্থপ্রতিমের সমস্ত সত্তা থেকে, সত্তার গোপন অন্ধকার থেকে। সে দেখ্‌তে পেলো, শ্রীলতা আছে, দেখ্‌তে পেলো শ্রীলতাকে। আর তা'র রক্তে লাগ্‌লো দোলা; অনেক অস্পৃষ্ট কথায় মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠ্‌লো তা'র মন। তবু, শ্রীলতার সঙ্গে পরিচিত হ'তে সে কোনোরকম চেষ্টাই করে নি: তা'র কারণ অবিশ্যি সাহসের অভাব নয়, তা'র গর্ব্ব। শ্রীলতাকে ঘিরে যে-ভিড়, তা'র মধ্যে ঠেলাঠেলি কর্‌বার কথা সে ভাব্‌তে পার্‌তো না। সুতরাং সে রইলো দূরে, আর সময় বয়ে' যেতে লাগ্‌লো।

প্রবন্ধপর্ব্ব

ইতিমধ্যে এক ব্যাপার হ'লো। ইউনিভার্সিটিতে নতুন একটা প্রবন্ধ লেখ্‌বার প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হলো: তা'র বিষয় একটু অদ্ভুত, 'মানুষ কেন অন্যায় করে।' সবারই মনে খট্‌কা লাগ্‌লো: কথাটা যেন রসিকতার মত শোনাচ্ছে। সমস্তটা লাইব্রেরি

যে-সব ছেলের নখদর্পণে, তা'রা ও-বিষয়ে কোনো রেফারেন্সের বই খুঁজে-খুঁজে হয়রান হ'তে লাগ্‌লো। মুস্কিল, পাওয়া যায় না কোনো বই। এমন কি, ওটা ঠিক কোন্ বিষয়ের মধ্যে পড়ে, তা নিয়েও ডাকশাঁইটে ছেলেদের মধ্যে তর্ক লাগ্‌লো। কেউ বল্‌লে, বায়লজি, কেউ বল্‌লে, ফিলজফি: অ্যান্‌থ্রপ-লজি, সোশ্যলজি, ক্রিমিনলজি ইত্যাদি আরো অনেক নাম উচ্চারিত হ'লো। বিষয়টা যে কী, সেটা অবিশ্যি আগে নির্দ্ধারণ করা দরকার: কেননা, তা জান্‌তে পার্‌লে তবে তো সে-বিষয়ের একরাশ বই পড়া যাবে, এবং একরাশ বই পড়্‌তে পার্‌লে তবে না প্রবন্ধকে করা যাবে এমন যে পরীক্ষক ভয় পেয়েই পুরস্কার দিয়ে দেবেন।

শেষটায় এক ফাজিল ছোক্‌রা বল্‌লে, 'মিছিমিছি তোমরা জট্‌লা কর্‌ছো; প্রাইজটা কা'র জন্য, তা তো আমরা সবাই জানি।'

অম্বিকাচরণ ফিলজফিতে গোল্ড্‌-মেডালিস্‌ট্‌; অল্প বয়েস থেকেই সে দাড়ি রাখ্‌ছে। সে রুখে উঠে বল্‌লে, 'রেখে দাও; দু'পাতা ফুর্‌ফুরে ইংরিজি লিখ্‌তে পার্‌লেই সব সময় চলে না।'

ইকনমিক্সের পয়লা নম্বর সোনার চশ্‌মাটার দু'দিকে

একটু চাপ দিয়ে বল্‌লে, 'পার্থ! এ-সব বিষয়ের ও কী জানে! ও তো পড়ে লিট্রেচার—আর এ যে দস্তুরমত সায়ান্সের এলাকায়।'

কিন্তু মনে-মনে সবারই ভয় রয়ে' গেলো। পার্থ যে কিছুই জানে না, এমন কি, তা'র নিজের বিষয়েও নয়, এ-বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু কলম নিয়ে ও যে কী ভোজবাজি কর্‌বে, আর তা'দের সবার নাকের সাম্‌না থেকে ঝুলন্ত প্রাইজটা কেড়ে নিয়ে চলে' যাবে···কিছুই বলা যায় না। বিদ্যার ভার যা'র যতই থাক্, তা প্রকাশ কর্‌বার বিস্তৃত ক্ষেত্র চাই—আড়াই হাজার শব্দের মধ্যে কতটুকু আর ঠাসা যাবে! কিন্তু কলমের ধার মুহূর্তের মধ্যে কেটে দিয়ে চলে' যায়; চমক তা'তেই লাগে। তা'র মানে, ফাঁকি দিতে পার্‌লেই তুমি জিৎবে। এটা এমনই অন্যায় যে তা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও যায় না।

পার্থপ্রতিমের কথা ভেবে অনেক ছেলেই শেষ পর্য্যন্ত পেছিয়ে গেলো: মনে-মনে ভাব্‌লে, লিখ্‌লে যে পাবো না, তা তো নিশ্চিত; যদি না লিখি, তা হ'লে লিখ্‌লে যে পেতুম না, এ-কথা কেউ জোর করে' বল্‌তে পার্‌বে না। ডাকশাঁইটে ছেলেরা লেগে রইলো; প্রাইজের টাকার অঙ্কটা ছিলো লোভনীয়। সমস্ত

ইউনিভার্সিটি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লো, কী হয়।

প্রবন্ধ দাখিল কর্‌বার যেদিন শেষ তারিখ, অম্বিকাচরণ পার্থকে গিয়ে বল্‌লে, 'আপনি সব্‌মিট করেছেন ?'

'অনেক আগেই করেছি।'

'আমি এইমাত্র দিয়ে এলুম। এখন একটু ডিস্‌কস্‌ কর্‌তে আপত্তি নেই—কী বলেন ?'

'আপত্তি কখনোই ছিলো না।'

'আপনি জিনিসটাকে কোন্‌ দিক থেকে দেখেছেন—বড্ড বেজুত ব্যাপার, না ?'

'কবে লিখেছি—কিচ্ছু মনে নেই এখন।'

অম্বিকাচরণ মনে-মনে বল্‌লে, 'ছাখো, এখনো আগ্‌লে রাখ্‌ছে—যেন ওঁরটা জান্‌তে গেলে আমি গিলে ফেল্‌বো।' মুখে বল্‌লে, 'অন্তত সেণ্ট্রাল আইডিয়াটা—'

পার্থপ্রতিম হেসে বল্‌লে, 'লিখেছি, ফুরিয়ে গেছে—তা নিয়ে কে এখন ভাব্‌তে যায়। তা ছাড়া, আমার লেখাটা ভালোও হয় নি।'

অম্বিকাচরণ বাঁকা হেসে বল্‌লে, 'তা না-ই বা হ'লো ; আপনিই পাবেন প্রাইজ।'

পার্থপ্রতিম একটু দ্বিধা না করে' বল্‌লে, 'হ'তে পারে তা-ই।'

অম্বিকাচরণ চলে' যেতে-যেতে অস্ফুটস্বরে বল্‌লে, 'বাবাঃ, দেমাক বটে!'

পার্থপ্রতিম যে বিনয় করে' বলে নি, 'না, না, আমি কী করে' পাবো', তা'র কারণ সে সত্যি বিশ্বাস কর্‌তো যে সে-ই পাবে প্রাইজ। যদিও সে মনে-মনে জান্‌তো যে লেখাটা খুব ভালো হয় নি। কিন্তু তা'র খুব-ভালো-নয় লেখার সঙ্গে অন্য-কারো খুব-বেশি-ভালো লেখাও যে পাল্লা দিতে পার্‌বে, এমন সন্দেহ তা'র মনে কখনো হ'তো না। সে যখন লিখেছে, তখন সেটাই যে সব চেয়ে ভালো দাঁড়িয়ে যাবে, এ তো জানা কথাই।

এদিকে ছেলেদের মধ্যে চল্‌তে লাগ্‌লো তুমুল জল্পনা, তর্কাতর্কি। কেউ বল্‌লে, 'দেখে নিয়ো, অম্বিকা-চরণই মেরে দেবে এটা। ভাব্‌তে পারো, হ্যাচ্‌রেল হিস্‌ট্রির বারোটা ভল্যুম ঘেঁটেছে।' কেউ বা ইক-নমিক্সের পয়লা নম্বরের নাম কর্‌লে; সে নাকি মানব-সমাজের ইতিহাস থেকে এমন-সব দৃষ্টান্ত জড়ো করেছে, যা—মোট কথা, যা দেখে তাক লেগে যায়। পার্থ-প্রতিমের নাম মাঝে-মাঝে উচ্চারিত হ'তো, এবং তৎ-ক্ষণাৎ হেসে উড়িয়ে দেয়া হতো। একটু লক্ষ্য কর্‌লে বোঝা যেতো যে পার্থপ্রতিম সম্বন্ধে ভয় আছে সবার

মনেই, এবং তা'র হাত থেকে যদি এটা কোনোক্রমে ফস্‌কায়, তা হ'লে সবাই পরম খুসি হয়।

গরমের ছুটির কয়েকদিন আগে ফল বেরুলো ; প্রাইজ পেয়েছে শ্রীলতা দত্ত।

হঠাৎ স্রোত একেবারে ঘুরে গেলো। শ্রীলতার কথা কারো একবারও মনে হয় নি : কল্‌কাতার সব সেরা কলেজ থেকে আগত বাছা-বাছা ছেলেদের ডিঙিয়ে কোথেকে একটা মেয়ে এসে কিনা কেড়ে নিয়ে গেলো এমন একটা প্রাইজ! একটা মেয়ে! মাসকয়েক আগে যে-সব ছেলে শিভ্যল্‌রির চাপে মারা পড়্‌ছিলো, এখন তাদের মধ্যেই দেখা গেলো পৌরুষ আর বাঁধ মান্‌ছে না। তা'রা সবাই একযোগে ছি-ছি কর্‌তে লাগ্‌লো : এ নাকি সমস্ত পুরুষজাতির বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রতি তীব্র অপমান, এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না। সব চেয়ে, সব চেয়ে লজ্জার কথা এই যে পার্থপ্রতিমের প্রতি এমন ঘোর অন্যায় করা হ'লো।

কারণ, আগে যারা পার্থপ্রতিমের ঘোর বিরোধী ছিলো, তা'র হার হ'লে যারা খুসি হতো, তার পক্ষ নিয়ে কথা কইতে এখন তা'রাই হ'য়ে উঠ্‌লো শতমুখ। জোর গলায় তা'রা বল্‌তে লাগ্‌লো, পার্থপ্রতিম যেখানে

প্রতিদ্বন্দ্বী, সেখানে যে অন্য-কেউ কাছাকাছিও আস্‌তে পারে, এটা দস্তুরমত একটা স্ক্যাণ্ডল্‌, এর অবিচার দিনের আলোর মত স্পষ্ট। আসল কথা, প্রত্যেকের পরাজয়ের লজ্জার তা'রা শোধ তুল্‌তে লাগ্‌লো পার্থ-প্রতিমকে উপলক্ষ্য করে'। ইক্‌নমিক্সের ছেলেটি সোনার চশ্‌মার ঝলক তুলে বল্‌লে, 'এ তো জানা কথাই; বাঁকা ছাঁদের হাতের লেখা দেখ্‌লেই ভুলে না যায়, এমন অধ্যাপক কে আছে?' আর-একজন যোগান দিলে, 'এই তো সেদিন দেখলুম, ডক্টর কর মিস্‌ দত্তর গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বিগলিত হ'য়ে কথা কইছেন।' পরীক্ষকদের উদ্দেশ্য করে' আরো যে-সব কথা মুখ থেকে মুখে ঘোরাঘুরি কর্‌তে লাগ্‌লো, তা'র এখানে পুনরাবৃত্তি না-করাই ভালো।

অম্বিকাচরণ পার্থপ্রতিমকে গিয়ে বল্‌লে, 'কী বিশ্রী কাণ্ড হ'য়ে গেলো, মশাই।'

'বিশ্রী আর কী। যে-কোনো একজনই তো পেতো।'

'আমরা কিন্তু বরাবরই ভাবতুম আপনার চান্স্‌ই—'

'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলুম আমার লেখাটা তেমন ভালো হয় নি।'

অম্বিকাচরণ হতাশ হ'য়ে ফিরে গেলো। সে ভেবে-ছিলো, পার্থপ্রতিম রাগে ফেটে পড়্‌বে, আর সে

পরোক্ষভাবে মিটিয়ে নিতে পার্‌বে তা'র নিজের মনের ঝাল। মনে-মনে বল্‌লে, 'ধন্যি লোক! হেরে যাবেন, তবু ওঁর মান ষোলো আনা বজায় থাকা চাই।'

পার্থপ্রতিমের এই অভাবনীয় পরাজয় অধ্যাপক-মহলেও আলোচিত হ'লো। কয়েকটা মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত কর্‌ছি :

'আমার বরাবারই মনে হয়েছে, পার্থ ছেলেটা একটু সুপারফিশ্‌ল্‌।'

'হ্যাঁ, যাচাই করে' দেখ্‌তে গেলে ওর অনেকটাই ফাঁকি।'

'ফাঁকি দিলেই যা'র চলে, সে যদি ফাঁকি না দেয়, তা হ'লে তা'কে বোকা বল্‌তে হয়।'

'এত অনায়াসে এমন গুছিয়ে লেখ্‌বার ক্ষমতা আমি তো এই প্রথম দেখ্‌লুম।'

'চীপ ফ্যাসিলিটি! তাড়াতাড়ি লিখ্‌তে পারে জানে বলে'ই ও তাড়াহুড়ো করে।'

'ওর দোষই এই যে ও কেয়ার করে না। কখনো সীরিয়াস্‌ হ'তে পারে না। একটু মন দিয়ে লিখ্‌লে ও-ই পেয়ে যেতো প্রাইজটা।'

শেষের উক্তিটি ডক্টর করের। মনে-মনে তিনি পার্থপ্রতিমকে একটু ভালোবাস্‌তেন। যদিও তিনি

জান্‌তেন, তাঁর কোনো লেকচারের এক বর্ণও এ-পর্য্যন্ত পার্থপ্রতিমের কানে ঢোকে নি। বোধ হয় সেইজন্যই ভালোবাস্‌তেন।

একদিন করাইডর দিয়ে যেতে-যেতে পার্থপ্রতিমকে দেখ্‌তে পেয়ে তিনি তা'কে ডাক্‌লেন। ইংরিজিতে বল্‌লেন, 'ছাখো দে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত তুমি প্রাইজটা পেলে না। আমরা সবাই আশা করেছিলুম—'

পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'এতে আর এমন-কী এসে যায়।'

ডক্টর কর তবু গায়ে পড়ে'ই বল্‌লেন, 'যে-ব্যক্তি পেয়েছে, তা'র লেখাটা এমন সম্পূর্ণ হয়েছিলো—তুমি বোধ হয় তাড়াতাড়িতে—'

'সেই ব্যক্তির লেখা আমারটার চাইতে নিশ্চয়ই ভালো হ'য়ে থাক্‌বে,' পার্থপ্রতিম তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌লো।

সেই ব্যক্তি

এ-পর্য্যন্ত পার্থপ্রতিম আর শ্রীলতা কখনো বাক্যবিনিময় করে নি। কিন্তু ছুটি হবার আর দু'তিন দিন মাত্র যখন বাকি, হঠাৎ ওদের দেখা হ'য়ে গেলো লিফ্‌টে।

লিফ্‌ট্‌ম্যান দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলো, একটু দূর থেকে দেখ্‌তে পেয়ে পার্থপ্রতিম তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ঢুকে পড়্‌লো। ঢুকেই একেবারে শ্রীলতার মুখো-মুখি। কোনো কথা না বল্‌লে ভালো দেখাতো না।

পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'একটা সুযোগ পেলুম আপনাকে কন্‌গ্র্যাচুলেট কর্‌বার।'

'কী নিয়ে?'

'আপনার প্রাইজ। সত্যি আপনাকে প্রশংসা কর্‌তে হয়, যখন দেখা যাচ্ছে আমিও ওটার জন্য চেষ্টা করেছিলুম।'

'আমার ভাগ্য,' শ্রীলতা হেসে বল্‌লে, 'মানে, আপনি যে চেষ্টা করেছিলেন, সেটা আমার ভাগ্য।'

'কিন্তু ওটা আমি বল্‌তে গেলে বাঁ হাত দিয়ে লিখেছিলুম।'

'আর সত্যি বল্‌তে, আমার লেখাটা আমি নিজেই লিখি নি।

মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লিফ্‌ট্‌ থেমে গেলো। বেরিয়ে আস্‌তে-আস্‌তে পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'আপনার মুখের ও-মিথ্যেটা শুনে আমি কিছুমাত্র সান্ত্বনা পাবো না; কেননা, যে-কোনো লোক আমার চাইতে ভালো লিখ্‌বে, এ চিন্তা আমার পক্ষে অসহ্য।'

শ্রীলতা হেসে উঠ্‌লো।—'যা-ই হোক্‌, আপনাকেই ধন্যবাদ। আপনারই জন্য মনে কর্‌তে পার্‌ছি, ভয়ানক একটা-কিছু করে' ফেলেছি।' দুজনে ক্লাশের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদ্‌লে শ্রীলতা জিজ্ঞেক কর্‌লে, 'ছুটিতে কোথায় যাবেন, মনে করেছেন?'

পার্থপ্রতিম টের পেলো, মুহূর্তে তা'র মুখ একটু লাল আর গরম হ'য়ে উঠেছে। এ-প্রশ্নের মানেই এই, আমি তো গরম পড়্‌লেই পাহাড়ে চলে' যাই—আপনিও নিশ্চয়ই তা-ই? এদিকে পার্থপ্রতিম তো এ-পর্য্যন্ত দার্জিলিং চোখে ছ্যাখে নি। যে-কোনো জিনিষ, যে-কোনো কথা—যতই পরোক্ষভাবে, যতই অনুদ্দিষ্টভাবে হোক্‌, ইঙ্গিত করে তা'র দারিদ্র্যের দিকে, মনে করিয়ে দেয়, সে গরিব—তা-ই সে অত্যন্ত অপছন্দ করে, তা'র পক্ষে তা একটা বিশ্রী অস্বস্তি। সে ভুলে' থাকৃতে চায়, সে সত্যি-সত্যি ভুলে' থাকে যে সে গরিব। কারণ, পার্থপ্রতিম জানে, গরিবিয়ানা তা'কে মানায় না। সে যে-রকমের লোক, তা'র সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যকেই মেলানো যায়। নিজকে সে কখনো ভাব্‌তে পারে না গরিব বলে। গরিব—এই কথাটার মধ্যেই কী হীনতা, কী অসহ্য অপমান। পার্থপ্রতিম তা'র জীবনকে বেঁধেছে

তা'র সত্যিকারের অবস্থার অনেক উপরে—তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে কথা কয়, চলাফেরা করে। সেটাকে ভাণ বল্‌লে ভুল হবে, সেটাই তা'র মেজাজ। যদি কখনো বাইরের কোনো কারণে সে মনে কর্‌তে বাধ্য হয় যে তা'র খরচ কর্‌বার ক্ষমতা অত্যন্ত পরিমিত, তা হ'লে মেজাজে ঘা লাগে, সেটা সহ্য হয় না।

'কোথাও যাবো না, এখানেই থাক্‌বো', স্পষ্টভাবে পার্থপ্রতিম বল্‌লে।

'আমাকে বোধ হয় দার্জিলিং যেতে হবে শিগ্‌গিরই। ভালো লাগে না আর দার্জিলিং।'

কথাটা শ্রীলতা বলেছিলো নেহাৎ সাধারণভাবে, নিছক একটা উক্তি-হিসেবে; কিন্তু পার্থপ্রতিমের মনে তা খচ্‌ ক'রে' বিঁধ্‌লো। তা'র কানে সেটা শোনালো কিছু গায়ে-পড়া গোছের—যেন তা'কে শুনিয়েই বলা। আমার কাছে তো দার্জিলিং পচে' গেছে—আর আপনি যে সেখানে যাবেন না, তা ইচ্ছে করে' নয়, যেতে পারেন না বলে'। কিন্তু শ্রীলতার দার্জিলিং আর ভালো লাগে না, এটা সত্যি কথা মাত্র: আর পার্থ-প্রতিমের ঘরের খবর জান্‌বার কোনো কারণই তা'র নেই। কিন্তু এম্‌নিই হয়। যেখানে নিজের সম্বন্ধে টন্‌টনে সঙ্কোচ, সেখানেই আমরা মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে

ফেলি; যেখানে আমাদের মন সব চেয়ে দুর্ব্বল, সেখানেই সব চেয়ে বেশি ভয়, সব চেয়ে বেশি ভুল বোঝা। 'ভালো যদি না-ই লাগে', অনাবশ্যক জোর দিয়ে পার্থপ্রতিম বলে' ফেল্‌লো, 'তা হ'লে কেন যাচ্ছেন?'

'তাই তো! বলেছেন ঠিক কথাটা। অভ্যেস—তা ছাড়া আর কী।' শ্রীলতা আরো বোধ হয় কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলো, কিন্তু প্রোফেসর এসে পড়্‌লেন; দু'জনে ঢুকে পড়্‌লো ক্লাশে।

পার্থপ্রতিমের মনে একটা খচ্‌খচানি রয়ে'ই গেলো—যেন শ্রীলতাকে বল্‌বার আরো কথা তা'র ছিলো, যা বল্‌তে না-পারা অস্বস্তি। ক্লাশ শেষ হ'য়ে যাবার পর সে খুঁজে বার কর্‌লে শ্রীলতাকে। বল্‌লে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, যদি কিছু মনে না করেন।

'কী কথা?'

'তখন কেন আপনি ও-মিথ্যেটা বল্‌লেন যে ওটা আপনার নিজের লেখা নয়?'

'সবাই তা-ই বল্‌ছে যে।'

'সবাই—কারা?'

'এই—ছেলেরা।'

'আপনি জান্‌লেন কী করে'?'

'পেরেছি জান্‌তে।'

পার্থপ্রতিম প্রতিবাদ কর্‌লে না, চুপ করে' রইলো। ছেলেদের স্বভাব সে জান্‌তো। স্ত্রীজাতির চ্যাম্পিয়ন তা'রা। বাস্‌-এ একটা মেয়ে উঠ্‌লে চারজনে জায়গা ছেড়ে দেবে। দৈবক্রমে কোনো ভদ্রলোক কোনো মেয়ের পাশে বসে' পড়্‌লে তাঁকে অপমান কর্‌তে ছাড়্‌বে না। শিভ্যল্‌রি ফুটছে তাদের রক্তে টগ্‌বগ্‌ করে'—কা'র সাধ্য চাপা দিয়ে রাখে। তাদেরকেই মানায় এ-কথা রটানো! উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো মেয়ের জয় তা'রা সহ্য কর্‌বে কী করে'? মেয়েরা যে তা হ'লে প্রায় পুরুষই হ'য়ে উঠ্‌লো। তা হ'লে কা'কে আর জায়গা ছেড়ে দিয়ে তা'রা জীবন ধন্য কর্‌বে?

একটু পরে শ্রীলতা বল্‌লে, 'আপনি অত গম্ভীর হ'য়ে গেলেন কেন? ও-কথা ভেবে যদি কারো ভালো লাগে তো ভাবুক্ না; ক্ষতি হচ্ছে না তো কোনো। তা ছাড়া, একটু রাগ তো হ'তেই পারে আমার উপর—সেটা এমন-কী অন্যায়। আর, ওদের মনে যে এতটা লেগেছে, তা'র কারণ অবিশ্যি আপনি। আপনি হেরে গেলেন, এটা ওরা ঠিক বিশ্বাস করে' উঠ্‌তে পার্‌ছে না।'

পার্থপ্রতিম সোজা শ্রীলতার চোখের দিকে একটু

তাকিয়ে রইলো; তারপর বল্‌লে, 'যদি কারো কাছে আমাকে হার্‌তেই হ'তো, আপনার কাছে যে হেরেছি, এইটেই সুখের কথা।'

'ভালোই হ'লো যা হোক্ আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে,' শ্রীলতা আলাপের মোড় ফেরাবার চেষ্টা কর্‌লে।

'কেন? যেহেতু বুঝতে পার্‌বেন, আমার দৌড় কতদূর?'

'তা যদি হয়ও, উদ্দেশ্যটা অসৎ নয়। তা ছাড়া, রাইভল্‌দের মধ্যে বন্ধুতা থাকা খুব দরকার।'

'বন্ধুতা কি আর ইচ্ছে কর্‌লেই হয়।'

'দু' পক্ষ ইচ্ছে কর্‌লেই হয়।'

পার্থপ্রতিম কিছু বল্‌লে না। শ্রীলতা আপাতত অকারণে হেসে উঠে বল্‌লে, 'বলে'ই ফেলি সত্যি কথাটা। এখানে এসে অবধি চারদিকেই শুন্‌ছি আপনার কথা। একেবারেই চেনা না হ'লে বিশ্রী হ'তো ব্যাপারটা।'

'আমিও খুব খুসি হ'লাম আপনার চেনা করে'।'

আলাপটা ভদ্রবাণী-বিনিময়ের দিকে ঝুঁক্‌ছিলো, হঠাৎ থেমে গেলো। পার্থপ্রতিম মনে-মনে ভাব্‌ছিলো, এইবার সে বিদায় নেবে কিনা, এমন সময় শ্রীলতাই আবার কথা পাড়্‌লে, 'মাঝখানে তো দু' ঘণ্টা ছুটি—কী কর্‌বেন?'

'আমি বাড়ি যাবো।'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'ভবানীপুরে।'

'ভবানীপুরে কোথায়?'

পার্থপ্রতিম রাস্তার নাম কর্‌লে।

'আমার বাড়ির কাছেই তো তা হ'লে। আমিও যাবো চলুন।

'কিন্তু আমি তো বাস্‌-এ যাবো।'

'আমিও আজ তা-ই।'

বাস্‌-এ উঠে শ্রীলতা জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'আদিত্য কাগজে যে মূর্চ্ছা নামে একটা গল্প দেখ্‌লুম, সে কি আপনার লেখা?'

'হ্যাঁ, আমার লেখা।'

'ও-গল্প আপনি কেন লিখ্‌তে গেলেন?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'কিছুই হয় নি।'

'কিছু হবে বলে' তো ওটা লিখি নি।'

'তা হ'লে কেন লিখেছিলেন?'

'কেন? নিজের খুঁসির জন্য—তা ছাড়া আর কী? আপনি যে-কারণে সাজগোজ করেন, আমিও সে-কারণে লিখি।'

'তা'র মানে? আমি সাজি তো যা'তে অন্যের চোখে পড়্‌তে পারি। তা হ'লে আপনি লেখেন নামের জন্য?'

'আপনি অন্যের চোখে পড়্‌বার জন্য সাজেন, এ-কথা আপনাকে কে বল্‌লে? আপনার সাজটা হচ্ছে মনের ঘুরে বেড়াবার খানিকটা ফাঁকা জায়গা, আমার লেখাটাও তা-ই। দুটোই মনের পেখম-তোলা গোছের ব্যাপার।'

'উপমা কিন্তু গুলিয়ে গেলো।'

'দুঃখিত। সাম্‌লাতে পারি নে, এত কথা আসে মনে। কিন্তু আপনি, আশা করি, উপমা গুলিয়ে না-দেবার আর ইন্‌ফিনিটিভকে দ্বিখণ্ডিত না-কর্‌বার চেষ্টাতেই নিজকে খরচ করে' ফেলেন না?'

পার্থপ্রতিমের চোখের দিকে তাকিয়ে শ্রীলতা একটু হাস্‌লো: 'নিয়ম ভাঙ্‌বার গৌরব আমার মত লোকের জন্য নয়। সেটা মস্ত বড় দায়িত্ব।'

পার্থপ্রতিমের মনে হ'লো, লঘু পরিহাস থেকে শ্রীলতার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ অন্য রকম সুর বেজে উঠ্‌লো। সে কোনো কথা বল্‌লে না। বাস্‌ ছুটে চলেছে বৌ-বাজারের সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়ে পুরো-দমে। হঠাৎ তা'র খেয়াল হ'লো, বাস্‌-এর অন্য-সব যাত্রী চুপচাপ—

এতগুলো লোকের মধ্যে তা'রা দু'জনই শুধু কথা কইছিলো। তা ছাড়া আর কেউ কাউকে চেনে না। অতি সাধারণ ব্যাপার; রোজই দেখি, কোনোদিন চোখে পড়ে না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে পার্থপ্রতিমের কাছে তা নতুন লাগ্‌লো, আশ্চর্য্য লাগ্‌লো। মনে হ'লো, কী ভাগ্য আমার, আমি যা'র পাশে বসে' আছি, আমি তা'কে চিনি, কথা বল্‌তে পার্‌ছি তা'র সঙ্গে।

শ্রীলতাই আবার কথা বল্‌লে: 'আমার মত লোককে ছোটখাটো যে-সব কাজ কর্‌তে দেয়া হয়, তা যদি লক্ষ্মী ছেলের মত করে' উঠ্‌তে পারি, তা-ই ঢের। সম্প্রতি আমার কাজ হচ্ছে এম্-এ পাশ করা। বল্‌তে পারেন, কী কর্‌লে পাওয়া যায় ফার্স্ট্ ক্লাশ?'

'কিছু না-করে'ই আপনি পাবেন।'

'সে তো বুঝ্‌লাম,' শ্রীলতা হেসে বল্‌লে 'কিন্তু একটা কথা। থ্যাকারের সবগুলো নভেল কি পড়্‌তেই হবে?'

'যদি প্রচুর সময় থাকে হাতে, মন্দ কী?'

'সময়ের ছড়াছড়ি,তবে—' বলে' শ্রীলতা চুপ কর্‌লো।

'তবে? আর-কোনো আনন্দ না পান্, রবিঠাকুর যেমন বলেন, শেষ কর্‌বার আনন্দ তো পাবেন।'

'আনন্দের জন্য কেউ পরীক্ষা পাশ করে?'

'তা-ই বা নয় কেন? যদি মনে করেন ভার, তা হ'লে শুধু বইয়ের চাপে মারাই পড়্বেন; আর ভালো যদি লাগাতে পারেন, দেখ্বেন, কিছু গায়েই লাগ্ছে না।'

'কিন্তু ভারই তো—তা ছাড়া আর কী? বিষম এক দায়—কোনোরকমে সার্তে পার্লে বাঁচি।'

পার্থপ্রতিমের একটা দোষ ছিলো, যখন যে-কথা তা'র মনে হ'তো, সহজে সে সেটা ছাড়্তে চাইতো না; সেটাকেই বল্তে চাইতো পল্লবিত করে', প্রজাপতি-লঘুতায় উড়ে যেতে চাইতো কথা থেকে তৎভব কথায়। দোষ বল্ছি এই জন্যে যে তা'তে করে' সামাজিক আলাপনের মসৃণতায় বিঘ্ন ঘটে। সে ভালোবাস্তো তা'র মনের ভাবের উপর একটু-একটু করে' রঙ্ চড়াতে—ভালোবাস্তো সেই রঙ্, যা হচ্ছে গিয়ে কথা।. সুতরাং 'আমি দেখেছি,' সে বল্তে লাগ্লো, 'কোনো কাজ ভালো লাগ্লেই ভালো করে' করা যায়। 'কিন্তু আজকালকার কথা হচ্ছে কোনোরকম কিছু না-লাগা। তা'রই নাম এফিশেন্সি।'

'ও-সব কথা পরে হবে,' একহাতের তেলোর উপর অন্য হাতের আঙুলের ডগাগুলো একবার চালিয়ে নিয়ে শ্রীলতা বল্লে, 'সম্প্রতি, ফার্স্ট্ ক্লাশে পৌঁছবার একটা

সোজা উপায় থাকে তো বলে' দিন্। প্রোফেসরদের বক্তৃতা যতই শুন্ছি, ততই যেন আমার মাথার মধ্যে সব এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে। আগে যে-সব জিনিস অত্যন্ত সহজ ছিলো, অন্তত তা-ই মনে কর্তুম, আজ-কাল তা-ই ঠেক্ছে ধোঁয়াটে। ক্রমেই মনে হচ্ছে, কিছুই ঠিক বুঝ্তে পার্ছি নে।'

পার্থপ্রতিম হেসে উঠ্লো।—'শক্ত জিনিসকে সোজা কর্তে গেলে ভুল কর্বার বিপদ আছে, প্রোফেসররা তা'র ধার দিয়েও যান না। তাঁরা যা করেন, তা হচ্ছে সোজা জিনিসকে অসম্ভবরকম শক্ত ক'রে তোলা। তা'তে মান বজায় থাকে। ছাত্র কিছুই বুঝ্তে না পেরে মনে-মনে মাষ্টার মশাইকে অনেক বাহবা দেয়। তা ছাড়া, সেটা নিরাপদ। কেননা, যে-জিনিসের কোনো মানেই হয় না, তা'তে ভুল বলে' কিছু নেই।'

শ্রীলতা বল্লে, 'আচ্ছা, সত্যিই কি শেলির কবিতায় অমন সব ভালো-ভালো তত্ত্ব লুকোনো রয়েছে?'

'পি-এইচ্-ডিদের খাতিরে, অন্তত। তা না হ'লে তা'রা থাকে কোথায়?'

এর পর খানিকক্ষণ তা'রা ইংরিজি সাহিত্য নিয়ে পেশাদারি আলাপ কর্লে, যা'কে বলে গিয়ে শপ্। বাস্ পড়্লো এসে চৌরঙ্গীতে। উইলিয়ম মরিস্ যে

সত্যিকারের ভালো কবি—এবং আজকালকার যে-সব চমকওয়ালারা আর-কোনো বিষয়ে নতুনত্ব কর্‌তে না-পেরে পদ্য লিখ্‌ছে গদ্যের মত করে', কি আজগুবি ঢঙে সাজাচ্ছে লাইনগুলো, তাদের পিছনে না ছুটে মরিস্‌ পড়্‌লে যে আমরা ঢের ভালো কর্‌বো—এ-সব কথা বল্‌বার মাঝখানে পার্থপ্রতিম হঠাৎ থেমে গেলো। হঠাৎ তা'র মনে হ'লো, কেন বল্‌ছি এ-সব, কী এসে যায় এ-সব কথায়? মনে হ'লো, যেন সে বড় বেশি চেঁচিয়ে কথা বল্‌ছিলো, বড় বেশি উৎসাহ ছিলো তা'র কণ্ঠস্বরে। বোধ হয় শ্রীলতা ভালো করে' শুন্‌ছিলোও না।

একটা কথা আরম্ভ করে' সেটা ভালোরকম শেষ না-করে'ই পার্থপ্রতিম থেমে গেলো, কিন্তু শ্রীলতা যেন তা লক্ষ্যই কর্‌লে না। শ্রীলতা রইলো চুপ করে', মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। চৌরঙ্গীতে কেউ বড় একটা নামে না; বাস্‌ একটানা ছুটে চলেছে, এঞ্জিনের একঘেয়ে আওয়াজ শুন্‌তে-শুন্‌তে যেন ঘুম পেয়ে যায়। পার্থপ্রতিমও চুপ করে' রইলো; আর ভুলে' গেলো সে চুপ করে' আছে।

থিয়েটার রোডের কোণে পুলিশের উত্তোলিত বাহুর সামনে বাস্‌ থাম্‌লো। তখন শ্রীলতা তা'র দৃষ্টি ফিরিয়ে

আন্‌লে রাস্তা থেকে; পার্থপ্রতিমের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'আপনার সঙ্গে আরো আগে কেন আলাপ হ'লো না?'

পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'আমিও তা-ই ভাব্‌ছিলাম।'

সত্যি বল্‌তে, সে জান্‌তো না, এতক্ষণ কী ভাব্‌ছিলো সে। কিন্তু শ্রীলতার মুখে ও-কথা শুনেই তা'র মনে হ'লো—না, সে বুঝ্‌তে পার্‌লো যে সে তা-ই ভাব্‌ছিলো। শ্রীলতা যদি ও-কথা না বল্‌তো, তা হ'লে সে তা বুঝ্‌তে পার্‌তো না। এমন হয় প্রায়ই। আমাদের মনের কথা যখন শুনি অন্য-একজনের মুখে, তখনই আমরা জান্‌তে পারি, কী ছিলো আমাদের মনে।

মিনিট পাঁচেক পরে পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'আমি নাব্‌বো এখানে।'

'আমিও,' বলে' শ্রীলতা উঠে দাঁড়িয়ে দড়ি ধরে' টান্‌লে।

পার্থপ্রতিমের বাড়ির রাস্তা দিয়েই যেতে হয় শ্রীলতার রাস্তায়। বাড়ির দরজায় এসে সে অনির্দ্দিষ্টভাবে থেমে গেলো।

'এই বাড়ি আপনার?'

'হ্যাঁ।' এর পর একটু চুপ করে' থেকে পার্থপ্রতিম যদি একটা বিশেষ সুরে বল্‌তো, 'আচ্ছা,' বলে'

বাড়ির ভিতর ঢুকে যেতো, তা হ'লেও চল্‌তো; কিন্তু সেটা হয়-তো খুব ভালো দেখাবে না—তাই সে অপেক্ষা করলে। শ্রীলতারও ভাব দেখে মনে হ'লো যেন সে এক্ষুনি বল্‌বে: 'চলুন না আপনার বাড়িটে একটু দেখে আসি।' কিন্তু তা হ'তে পারে না, সে তা হ'তে দিতে পারে না। কেন? এটা তা'র প্রবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত্ত নির্দ্দেশ। এর কোনো যুক্তি নেই—তখনকার মত, অন্তত, ছিলো না।

(যদি পার্থপ্রতিম পরে ভেবে দেখে থাকে, তা হ'লে সে বুঝেছে যে কারণটা হচ্ছে নিজের উপর তা'র এই তীব্র চাপা রাগ যে সে—যে-কথাটাকে সে ঘৃণা করে, তা আর ব্যবহার করলুম না, যে তা'র বাইরের জীবনের যা সত্যিকারের রূপ, তা'র মনের গড়নের সঙ্গে তা'র সঙ্গতি নেই। টাকা, এটুকু সে বুঝ্‌তে শিখেছিলো, মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা মস্ত ব্যবধান, একটা অদৃশ্য দেয়াল, যা অনিবার্য্যরূপে বাধা দেবে কোনো সহজ, স্বাভাবিক সম্পর্ক-স্থাপনে। মানুষের মনের বিচরণ করবার যে-সব সাধারণ ক্ষেত্র, যা সমাজের, সময়ের, কোনোরকম ব্যক্তিগত বিবেচনার বাইরে, সেখানেও—না, সেখানেও সেই অদৃশ্য দেয়াল, সেখানেও ঠিক মেলে না, কোথায় যেন অস্বস্তির কাঁটা ফুটে থাকেই। মানুষ,

আমরা যা-ই বলি নে কেন, সাধারণত তা'র দৈনন্দিন জীবনের প্রণালী দিয়ে নিয়ন্ত্রিত; সেখানে যদি মোটা বৈষম্য থাকে, অন্য-সব জিনিস একত্র করে'ও সে-ফাঁক ভরানো যায় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, যে-লোক নিজের গাড়ি নিয়ে যথেচ্ছ বিচরণ কর্‌ছে, আর যে-লোকের অনেক সময় মুদি-দোকান থেকে বাস্‌ভাড়ার পয়সা ধার কর্‌তে হয়—এ দু'জনের বন্ধুতার পথে অনেক প্র্যাক্‌-টিক্‌ল্‌ বিঘ্ন আছে।

পার্থপ্রতিমের দু'একটি বড়লোকের ছেলের সংস্পর্শে আস্‌তে হয়েছে—অত্যন্ত ভদ্র তা'রা, অত্যন্ত বিনয়ী, মধুভাষী—বড় বেশি ভদ্র, বড় বেশি বিনয়ী। পাছে অজান্তে কোথাও কোনোরকম ঘা দিয়ে ফেলে, যেন এই ভয় তাদের মনে। কারণ, তা'রা জানে যে তা'দেরই ক্ষমতা আছে ঘা দেবার। সুতরাং সৌজন্যের বাড়াবাড়ি। আর সেই বাড়াবাড়ি হচ্ছে একরকমের সূক্ষ্ম পিঠ-চাপ্‌ড়ানো: আর পার্থপ্রতিম কিছুতেই কাউকে তা'র পিঠ চাপ্‌ড়াতে দেবে না। সে-জিনিসটা সে ঘৃণা কর্‌তো সব চেয়ে বেশি। কেউ হয়-তো বল্‌বেন, এটা হচ্ছে ইন্‌ফিরিয়রিটি-কম্‌প্লেক্স্‌; নিজকে ছোট মনে কর্‌বার বিষম ভয়, কেউ বুঝি আমাকে ছোট কর্‌লে। হ'তে পারে; আবার, নিছক আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও হ'তে পারে।

একজন, শেষ পর্য্যন্ত, সম্পূর্ণই থাক্‌তে চায়, থাক্‌তে চায় তা'র নিজত্বের চক্রের মধ্যে। পার্থপ্রতিম, যা-ই হোক্‌, বড়লোক বলে' যে এক জাত আছে, তা'দের থেকে দূরে থাক্‌তে পার্‌লেই বাঁচে ; মনে-মনে তাদের ভয় করে—ভয় করে তাদের বড় বেশি বিনয়ী, বড় বেশি ভদ্র পিঠ-চাপ্‌ড়ানোকে, ভয় করে এবং ঘৃণা করে। এই সব বড়লোকের ছেলেরা—বিনয়ের অবতার, মধুর ঝর্‌না ! তাদের কথা ভাব্‌লে পার্থপ্রতিমের ঢোঁক্‌ গিল্‌তে হয়। এতই রাগ।

রাগটা অবিশ্যি তা'র নিজের অবস্থার উপর—রাগ, এ-জন্য নয় যে সে সেই শ্রেণীর লোক নয়, পয়সার টানাটানি হ'লে যা'রা রেলগাড়ির সেকেণ্ড্‌ ক্লাশে চড়ে—ধনীকে ঈর্ষা-রূপ গণ-মনের পাপ থেকে সে একেবারে মুক্ত ছিলো। না, খুঁতখুঁত করা, নালিশ করা, আর সেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত নালিশকে বিবিধ যুক্তি-তর্কে সাজিয়ে সমগ্র মানবজাতির কান্না-হিসেবে উপস্থাপিত করা—এ-সব তা'র মাথায় কখনো আস্‌তো না, তা'র স্বভাবেই ছিলো না এ-সব জিনিস। সে যা, তা-ই নিয়েই সে বেশ সুখী ছিলো, তৃপ্ত ছিলো, তা'র কোনো অভাব ছিলো না ; অন্তত, সে তা মনে কর্‌তো না। তা'র রাগ এই জন্যে যে নিতান্ত দৈব, বাইরের, এবং

তা'র প্রকৃত ব্যক্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণ অবাস্তর একটা ব্যাপারে তা'র মনের একটা জায়গা কাঁচা থাকবে, দুর্ব্বল থাক্‌বে। কারণ, পার্থপ্রতিমের এমন বুদ্ধি ছিলো যে তা'র নিজের মনও তা'কে ফাঁকি দিতে পার্‌তো না; সে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌তো—ইচ্ছে করে' না-বুঝে থাকতো না—তা'র মনের আসল ভাবখানা কী। সে অপছন্দ কর্‌তো সেই দুর্ব্বলতাকে, যা টন্‌টন্ করে' উঠ্‌তো সেই অদৃশ্য দেয়ালের সঙ্গে কখনো ধাক্কা খেলে। সে-দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হ'তে সে চাইতো না। সে চাইতো নিজের মনে, নিজের জগতে থাক্‌তে—যেখানে তা'র স্পর্দ্ধা আগুনের শিখার মত, যেখানে তা'র ক্ষমতায় সে স্বাধীন। এমন-কোনো সংস্পর্শ সে তা'র প্রবৃত্তি থেকে এড়িয়ে চল্‌তো, যা তা'র মনের কাঁচা জায়গায় ঘা দিতে পারে।)

কয়েকটা অনির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্ত কাট্‌লো—অস্বচ্ছন্দ। শ্রীলতার চোখের আলোয় যেন ভেসে উঠ্‌ছে কথা। পাছে সে সত্যি-সত্যি বলে' ফেলে, পার্থপ্রতিম তাড়াতাড়ি বল্‌লে, 'চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'আর কে আছে আপনার বাড়িতে?' হাঁট্‌তে-হাঁট্‌তে শ্রীলতা জিজ্ঞেস কর্‌লে।

'মা।'

'আর ?'

'আর কেউ নয়।' পার্থপ্রতিম অস্বস্তি বোধ কর্তে আরম্ভ করেছিলো: তা'র ব্যক্তিগত জীবনে কেউ উঁকি দেবে, এটা সে পছন্দ কর্তো না। সে যা, সে তা-ই; লোকে তা'কে তা-ই বলে' গ্রহণ করবে, কোনো সাংসারিক, কোনো পরিবারগত সম্পর্কের পশ্চাৎপট বাদ দিয়ে, এই তা'র ইচ্ছে। এর পরে শ্রীলতা কী জিজ্ঞেস করবে—সে ভেবে অবাক হ'লো।

মিটারের খট্‌খট্‌ আওয়াজ কর্তে-কর্তে একটা ছেঁড়াখোঁড়া ট্যাক্সি চলে' গেলো তাদের গা ঘেঁষে। অন্য কথা পাড়্‌বার একটা সুযোগ পেয়ে খুসি, পার্থ-প্রতিম বল্‌লে, 'চলুন পেইভমেণ্টে ওঠা যাক্। একটা হাত কি পা ভেঙে বসায় কোনো মজা নেই।'

'আপনিও', হঠাৎ শ্রীলতা বল্‌লে, 'একবার আসুন না দার্জিলিঙ্।'

'কিন্তু কল্‌কাতার দারুণ গ্রীষ্মই যে আমি ভালোবাসি,' পার্থপ্রতিম হেসে উঠ্‌লো।

'বরফও ভালোবাস্‌বেন···আশা করি। একটা বাড়ি আছে, যেখানে গিয়ে আমি উঠ্‌বো, দাদার এক বন্ধু···' যেটুকু বলা হ'লো না, বোঝা গেলো।

'আপনি কি সমস্ত ছুটিটাই থাক্‌বেন ?'

'তা-ই তো কথা আছে।—আস্‌বেন একবার? জায়গাটা নানারকম বাজে লোকে ভর্ত্তি, অবিশ্যি; কিন্তু পাহাড়গুলো—বাস্তবিক গর্জাস্‌। আর ফুলগুলো নেশার মত।'

নেশার মত! কথাটা হঠাৎ পার্থপ্রতিমের কল্পনাকে নাড়া দিয়ে গেলো; সে তা'র চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেলে এক আশ্চর্য্য-সুন্দর দার্জিলিঙ্‌—ফুলের রঙে-রঙে সমস্ত আকাশে যেন নেশা ধরে' গেছে। সেই আকাশের নিচে, শাদা বরফে ঠিক্‌রে-পড়া গোলাপি সূর্য্যাস্তের মাঝখানে—কী রহস্য, বাসনার কোন্‌ অস্পষ্ট-শ্রুত গুঞ্জরণ। পার্থপ্রতিমের কল্পনা বেসামাল হ'য়ে উঠ্‌লো। একটা গল্প, একটা সম্পূর্ণ গল্প উন্মুক্ত হ'লো তা'র কাছে: সোনালি-নীল শহরে এক গ্রীষ্ম-যাপন, জীবনের একটা অবাস্তর মধ্য পরিচ্ছেদ, রঙিন কতগুলো মুহূর্ত্ত-সন্নিবেশ মিলে একটি আলোর রেখা। একটা ভালোবাসার গল্প, অবিশ্যি। সন্ধ্যার আবছায়ায়, কোনো রাস্তার মোড়ে, গাছের নিচে গোপন সম্মিলন; তাড়া-তাড়িতে, পাগ্‌লামিতে লেখা সব চিঠি; বিছানায় চুপচাপ শুয়ে-শুয়ে কী মধুর, কী প্রশান্ত ঘুম-না-আসা; রাত্রির গভীরতায় রুদ্ধশ্বাসে উচ্চারিত সব কথা, অনুচ্চারিত সব কথা। একেবারে সম্পূর্ণ একটা গল্প—এখন শুধু

লেখ্‌বার অপেক্ষা। কোনো-একদিন পার্থপ্রতিম এটা লিখ্‌বে—শিগ্‌গিরই। না-হয়, হঠাৎ অন্য-কোনো গল্প লাফিয়ে উঠ্‌বে তা'র মনে—এটা যাবে সরে', চাপা পড়ে' যাবে তলিয়ে—তারপর, অলক্ষিত, চিরকালের মত হারিয়ে যাবে সেই অজ্ঞাত অন্ধকারে, যেখানে সব বিস্মৃত চিন্তা, সব খণ্ডিত কল্পনার রাশীকৃত ভগ্নাংশ। হারিয়ে যাবে—আর, সে একবার মনেও কর্‌বে না, কখনো সেটা তা'র মনে ছিলো। কল্পনার হঠাৎ-আলোয় এই যে মুহূর্ত্তের বিদ্যুৎ-উন্মেষ—সমস্ত জীবনের মত এ-ই হবে তা'র লাভ।

'কিছু বলুন।'

পার্থপ্রতিম চম্‌কে উঠ্‌লো, তারপর অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে পড়্‌লো। 'দেখি, যদি যাওয়া হ'য়ে ওঠে—' অস্পষ্টভাবে সে বল্‌লে।

'দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সময় যাবে চলে', শ্রীলতা হেসে বল্‌লে, 'আসল কথা, আপনার ইচ্ছে নেই; আপনি যা ইচ্ছে না করেন, তা আপনি কখনোই করে' উঠ্‌তে পারেন না।'

'ইচ্ছে থাক্‌লেও অনেক জিনিস কর্‌তে পারা যায় না।'

'ইচ্ছে থাক্‌লেই সব করা যায়—যদি সে-ইচ্ছের যথেষ্ট জোর থাকে।'

পালিত স্ট্রিট দিয়ে তা'রা রিচি রোডের মোড়ে এসে পড়্লো। পার্থপ্রতিম বল্লে, 'আমি ফিরি এবার।'

'ঐ লাল বাড়িটা আমাদের। ছু' মিনিটের জন্য আস্বেন? চা খেয়ে যাবেন একটু?'

'না, না,' পার্থপ্রতিম তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্লো, 'আমি ফিরি।' ভিতরে-ভিতরে সে সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্ছিলো। তা'র বাড়ির সাম্নে দাঁড়িয়ে—তা'রো কি উচিত ছিলো না এ-কথা বলা? শ্রীলতাকে একটু চা খেয়ে যেতে মৌখিক অনুরোধ করা? কিন্তু মুস্কিল এই, শ্রীলতা হয়-তো সে-অনুরোধ রক্ষা করে'ই বস্তো। 'আমি ফিরি,' সে আবার বল্লে।

শ্রীলতা পিড়াপিড়ি কর্লে না। 'আচ্ছা, আপনাকে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে' রাখ্বো না। কাল দেখা হবে ইউনিভার্সিটিতে। অনেক ধন্যবাদ।'

'কিছুমাত্র নয়,' বলে' পার্থপ্রতিম ফির্তে যাচ্ছিলো, শ্রীলতা বল্লে, 'একটা কথা। কাল শুক্রবার, দেড়-টায় ছুটি—নয়?'

'তা-ই তো বোধ হচ্ছে।'

'ছুটির পর কাল কোথাও গিয়ে একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে—কী বলেন?'

'বেশ তো।'

'অনেক কথা আমাদের বল্‌বার থাক্‌বে।'

কিন্তু পরদিন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে পার্থপ্রতিম শ্রীলতাকে দেখ্‌তে পেলে না। মেয়েদের কমনরুমের বেয়ারার কাছে খোঁজ নিয়ে জান্‌লে, মিস্‌ দত্ত আজ আসেন নি। বাড়ি ফিরে এসে দেখ্‌লো, টেবিলের উপর অপেক্ষা কর্‌ছে এক চিঠি। তা'র মা বল্‌লেন, সে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই একজন লোক এসে দিয়ে গেছে এটা। পুরু, হল্‌দে রঙের খাম খুলে সে পড়্‌লে :

'এইমাত্র ঠিক হ'লো আজই যেতে হবে দার্জিলিঙ্‌। সুতরাং ইউনিভার্সিটিতে না গিয়ে বেরুতে হচ্ছে দরকারি জিনিস-পত্তর কিন্‌তে। (সমস্যা : প্রতিবারই কেন নতুন করে' জিনিস কিন্‌তে হয়? But where are the snows of yester-year? তারপর রাজ্যের প্যাকিং পড়ে' রয়েছে—সে এক ব্যাপার। কেন যে মানুষ এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যায়! মাঝখানে থেকে আমাদের চা-টা গেলো মাঠে মারা। অত্যন্ত দুঃখিত। ফিরে এলে আবার দেখা হবে।

শ্রীলতা'

ফিরে এলে! সমস্ত গ্রীষ্মের ছুটি। তিন মাস! কী দীর্ঘ সময় তিন মাস!

শ্রীলতার বাড়িতে এক সন্ধ্যা

কেটে গেলো তিন মাস—আমার কলমের এক আঁচড়ে; কেটে গেলো, একটা দ্রুত কম্পনের মত, জলের উপর মেঘের ছায়ার মত। দার্জিলিঙের পাহাড় থেকে পাহাড়ে কালো হ'য়ে নাম্‌লো বর্ষা, শ্রীলতা চড়ে' বস্‌লো কল্‌কাতার গাড়িতে, ইউনিভার্সিটি খুল্‌লো।

জানি, এমন বুদ্ধিমান পাঠক আছেন, যিনি বল্‌বেন, 'বা, এ যে ফাঁকি! কী করে' কাট্‌লো তিন মাস, তা বলো!' তিনি পড়েছেন সমালোচনার অনেক ভালো-ভালো কেতাব; জানেন সাহিত্যের সব কানুন্‌; খপ্‌ করে' ধরে' ফেলতে পারেন, কোথায় ফাঁকি দিলে লেখক। নিজের মনকে যদি বা খুসি করানো যায়, তাঁর চোখে ধূলো দেয়া যায় না।

বলি তবে। এ-ক'মাস শ্রীলতা দেখেছে বরফের গায়ে রঙের খেলা; চা খেয়েছে জিমখানা-ক্লাবে গিয়ে, দেখেছে নাচ, কখনো নিজেও হয়-তো দু'এক পাক ঘুরেছে; কাঠের জুতো পরে' চর্কিপনা করেছে বরফের

মেঝের উপর, যাকে বলে স্কেটিং; মন-খারাপ করেছে টেনিসে হেরে গিয়ে; আর-কিছু হাতে নেই, পিয়ানোয় বসে' করেছে টুংটাং; হঠাৎ খেয়াল হয়েছে, কল্‌কাতার বন্ধুকে আরম্ভ করেছে এক চিঠি, হয়-তো উঠে এসেছে শেষ না-করে'ই। আর পার্থপ্রতিম টেবিলের উপর জড়ো করেছে সাহিত্যের যে-সব শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বহুদিন থেকে সে নিজের কাছে প্রতিশ্রুত পড়্‌বে বলে': যেমন, রুসোর কন্‌ফেশন্‌স্‌, আর বজ্‌ওয়েল, আর প্যারা-ডাইজ রিগেইন্‌ড্‌ আর এম্‌নি-সব; কোনোটা দেখেছে পাতা উল্‌টিয়ে, কোনোটা পড়েছে দু'পাতা; পড়ে' ফেলেছে রাজ্যের নভেল, বাজারে চল্‌তি নতুন সব বই; অবাক হয়েছে, দুঃখিত হয়েছে নিজের আচরণে; তারপর একদিন ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বলেছে: 'এবার থাক্‌; এর পরে যখন সময় পাবো—নিশ্চয়ই।' এর পরের বার সে কিছুতেই আর নিজকে সাময়িক (বাৎসরিক, মাসিক!) খ্যাতির মোহে পড়্‌তে দেবে না; এর পরের দীর্ঘ অবসর সে কাটাবে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, শুধু তা-ই নিয়ে। তা'র মনে হ'তে লাগ্‌লো যেন এখনই সে যে-কোনো কথা উঠ্‌লে বজ্‌ওয়েলের একটা-না-একটা চুটকি গল্প লাগ্‌সই করে' বল্‌তে পার্‌ছে; যেন গ্রীক নাটকের স্বাদ পেয়ে আধু-

নিক সাহিত্যে তা'র একেবারে অরুচি ধরে' গেছে। নিশ্চিন্ত, সে খুলে বস্‌লো লণ্ডনের বুক্‌-সোসাইটির এ-মাসের মনোনয়ন।

এই তো। কিন্তু আসল কথাটা তো রয়ে' গেলো এই যে ছুটি ফুরুলো, কেটে গেলো তিন মাস। জীবন চলে ঢিলে তালে, এলোমেলোভাবে; যখন যা হওয়া উচিত, তা হয় না; চলে না, একটানা যেমন চল্‌লে ভালো হয় দেখ্‌তে; মাঝে-মাঝে ছিঁড়ে যায় বিশ্রী ফাঁকে, এখানে-ওখানে খামকা ফাঁকা। গল্প লিখ্‌তে বসে' আমি কেন তা'র নকল কর্‌তে যাবো। আমি তা-ই কর্‌বো, যা'তে আমার সুবিধে হবে; এক-লাফে পার হ'য়ে আস্‌বো মস্ত ফাঁক, ছেড়ে আস্‌বো যা'তে আমার দরকার নেই; আবার একদিনের কাহিনী লিখ্‌বো পাতার পর পাতা, যখন বুঝ্‌বো ঠিক সময়। যা করে' গল্পটা সাজাতে পারি মনের মত। ঐ সাজ-টাই যে গল্প।

প্রথম যেদিন দেখা হ'লো দু'জনে ইউনিভার্সিটিতে, মিনিটখানেক আলাপ হ'লো। পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'খুব ভালো ছিলেন আশা করি দার্জিলিঙে।'

'যেমন আশা করা যায়। আপনি এখানেই ছিলেন?'

পার্থপ্রতিম মাথা নাড়্লে। 'এবার মন্‌সুন্‌টা বড় দেরি কর্‌ছে।'

'দার্জিলিঙে কিন্তু পেয়েছিলুম দু'এক পশলা বৃষ্টি।'

একে আলাপ বলে না, বলে আলাপ করা। সব জিনিসের যেমন, কথা বলারও একটা ঠিক সময় চাই, চাই মনের বিশেষ-একটা সুর। এমন-যে একটা অতি সাধারণ ব্যাপার, একজনের সঙ্গে আর-একজনের আলাপ, তা'রও জন্যে আমাদের নির্ভর কর্‌তে হয়—মনের কোন্ গোপন রহস্যের, নিহিত কোন্ শক্তি-উৎসের উপর। ছুটির মধ্যে মাঝে-মাঝে পার্থপ্রতিমের মনে পড়েছে শ্রীলতাকে—পলাতক ছায়ার মত, ঈষৎ-স্ফুট প্রতিধ্বনির মত: যেমন সারাদিন ধরে' কবিতা পড়ে' রাত্তিরে বিছানায় শুতে গেলে ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে ঢেউ খেলিয়ে যায় সেই সুরের দোলা, ঝিকিমিকি কাঁপে ছন্দের ছায়া। বোঝা যায় না, এ কি সেই ছন্দেরই প্রতিধ্বনি ঘুমের ফাঁকে ছাড়া পেয়েছে, না কি এই মুহূর্ত্তে আমার মন নিজেরই ভিতর থেকে সৃষ্টি কর্‌লে এই নতুন সুর। আমি কি জেগে-জেগে আউড়ে যাচ্ছি, যা পড়েছি দিন ভরে', না কি স্বপ্নের মধ্যে আমারই অজান্তে কেঁপে উঠ্‌ছে তা'র অনুরণন। হঠাৎ হয়-তো চম্‌কে জেগে উঠি; দেখি, সুর গেছে

হারিয়ে। তেম্‌নি অস্ফুট, ছায়া-পলাতক পার্থপ্রতিমের মনে শ্রীলতার চিন্তা : স্পষ্ট একটা উপস্থিতি নয়, সব উপস্থিতির আড়ালে একটা সূক্ষ্ম সুর—যেমন রেল-গাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে' যেতে-যেতে মনে হ'তে থাকে, প্রচণ্ড লৌহচীৎকার ছাপিয়ে উঠ্‌ছে বিশ্বের অন্তর্লীন চিরন্তন সুর—যা তখনকার মত রূপ নেয় আমারই পরিচিত কোনো গানের সুরের, ফেল্‌তে পারি তা'কে ইচ্ছেমত যে-কোনো সুরের ছাঁচে : কানের উপর দিয়ে ভেসে যায় গাড়ির চাকার ঘর্ষণরব; মন দিয়ে শুনি গানের সুর। পার্থপ্রতিম অস্পষ্ট প্রত্যাশায় তাকিয়ে ছিলো শ্রীলতার ফিরে-আসার দিকে—কেন? তা'র নির্দ্দিষ্ট কোনো কারণ নেই; শুধু যেন তা'র মনের সুর-সঞ্চার ছাপিয়ে পড়্‌ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে নিজেরই ঠেলায়। মাঝে-মাঝে সে ভাব্‌তো দার্জিলিঙে শ্রীলতাকে : ফিরে-ফিরে আস্‌তো যে-গল্পটা সেদিন বিকেলে হানা দিয়ে-ছিলো তা'র মন; কখনো বা লোভ হ'তো লেখ্‌বার। কিন্তু বড় যে অস্পষ্ট গল্প; মাঝে-মাঝে ছিটোনো তা'র ফুলের রঙ্‌—একটা ছবি। সেই ছবিরই চারদিকে তা'র মন ঘুরে বেড়াতো, গল্প গড়ে' উঠ্‌তো না। যদি ভাব্‌তো লেখ্‌বার কথা, বুঝ্‌তে পার্‌তো না, কী লিখ্‌বে। এখন থাক্‌, দিন থেকে দিন সে ঠেলেছে,

পরে—আরো পরে। যতক্ষণ না গল্পটা একটু-একটু করে' নিঃসরিত হ'য়ে গেছে তা'র মন থেকে—সম-সাময়িক উপন্যাসের আবর্তে। শ্রীলতা ফিরে এলো : পার্থপ্রতিমের মনে হ'লো যেন অনেক কথা তাদের বল্‌বার থাক্‌বে হু'জনকে। সে মনে কর্‌তে পার্‌লে যে শ্রীলতাও বলেছিলো ও-কথা···সেদিন, কতদিন আগে! কিন্তু কাছাকাছি এসে দেখা গেলো, কোনো কথা বল্‌বার নেই ; ছন্দ গেছে কেটে।

কয়েকদিন পরে পার্থপ্রতিম পেলো সেই খস্‌খসে হল্‌দে কাগজের ছোট এক চিঠি :

'বন্ধুরা জেনে গেছে আমার প্রাইজ পাওয়ার খবর। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রাইজটা তা'রাই পেয়েছে—বড় জোর, আমি যে পেয়েছি, সে কৃতিত্ব তা'দেরই। সুতরাং তাদের বল্‌তে হয়েছে চায়ে—কাল বিকেলে। আপনি আস্‌বেন। যদিও, সত্যি বল্‌তে, খুব ভালো হয়-তো আপনার লাগ্‌বে না। বুত আস্‌বেন। পাঁচটার পরে যখন আপনার সুবিধে।

শ্রীলতা।'

চিঠি পড়ে' প্রথম পার্থপ্রতিমের মনে হ'লো, না-যাবার কোন্ অছিলা সব চেয়ে ভদ্রগোছের হয়। কিন্তু

পরমুহূর্ত্তেই, কেনই বা সে যাবে না, সে ভাব্‌লে। চিঠিখানা সে আর-একবার পড়্‌লো। না, যেতে তা'কে হবেই। সত্যি বল্‌তে, শ্রীলতা ঠিকই লিখেছে, খুব ভালো তা'র লাগ্‌বে না। এ-সব চা-সম্মিলন কী ব্যাপার, সে জান্‌তো। আড়ষ্ট, নির্ব্বাক তা'কে বসে' থাক্‌তে হবে ঘণ্টা দুই সময়; কোনোদিকে তাকাতে সাহস হবে না, পাছে কারো দিকে খুব বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা হ'য়ে যায়; চারদিকে বয়ে' চল্‌বে কথার স্রোত—এলিসা ল্যাণ্ডির ভুরু নিয়ে, রবিঠাকুরের নবতম গীতিনাট্য নিয়ে (কেউ-একজন কবির নিজের মুখে শুনে এসেছে), সুমিতা রয়ের নাচ নিয়ে (সে বসে' আছে দশ গজ দূরে), জয়ন্তী সেনের দ্বিতীয় স্বামী একবার চৌরঙ্গীর এক রেস্তোরাঁয় ভোজনান্তে কী অবিশ্বাস্য বখ্‌শিষ দিয়েছিলো, তা নিয়ে (জয়ন্তী সেন সহাস্যে যোগ দেয় সে-আলাপে), পেট্রোলের উপর নতুন ট্যাক্স্‌ বস্‌বার পর মন্মথ চাটুয্যে যে তা'র গাড়ি বেচে দিয়ে ট্যাক্সি চড়্‌ছে, তা নিয়ে—আর সে সারাক্ষণ ভাব্‌ছে, এখন উঠ্‌তে গেলে সেটা ভ য় ঙ্ক র অভদ্রতা হ'য়ে পড়ে কিনা। একটা সন্ধ্যা, পার্থপ্রতিম মনে-মনে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে, একটা সন্ধ্যা নষ্ট। একটা সন্ধ্যা উৎসর্গীকৃত ক্লান্তিকে, মৃত্যুকে। আর, এই সন্ধ্যা

নিয়ে সে কী কর্‌তে পার্‌তো, কী না কর্‌তে পার্‌তো!

সে যেমন ভেবেছিলো, পার্থপ্রতিম ব্যাপারটা মোটামুটি সেই গোছেরই দেখ্‌লে, সে যখন পরদিন সন্ধ্যায় গেলো শ্রীলতার বাড়িতে। ছায়া-ঘনিয়ে-আসা বাইরের লনে বেতের চেয়ার ছড়ানো, মাঝে-মাঝে ছোট, গোল টেবিল, চায়ের জিনিস রয়েছে তা'র উপর। আগন্তুকরা ছোট-ছোট দলে বিভক্ত; কোথাও বা দু' তিনজন একত্র হ'য়ে জট্‌লা কর্‌ছে এক কোণে দাঁড়িয়ে, কেউ বা বেড়াচ্ছে পায়চারি ক'রে। শাড়ির ঝল্‌মলানি, উচ্চহাসির কলস্বর। দেখ্‌তে ভারি সুন্দর, মোটের উপর।

কোন্‌খান থেকে যেন শ্রীলতা নিঃসৃত হ'য়ে এলো। 'কখন্ এলেন?'

'এই তো, এইমাত্র।'

'খুব খুসি হ'লাম, আপনি এসেছেন। আমার ভয় হয়েছিলো, আপনি হয়-তো আস্‌বেন না। আসুন।' শ্রীলতা তা'কে আগিয়ে নিয়ে গেলো একটা টেবিলে, যেখানে বসে' ছিলেন নিখুঁত সায়েবি পোষাক-পরা, নিখুঁতভাবে চুল-উল্টিয়ে-দেয়া এক নিখুঁত ভদ্রলোক। শ্রীলতাকে দেখেই তিনি ব'লে' উঠ্‌লেন, 'হ্যালো, শ্রী,

কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?' তাঁর বাংলা উচ্চারণ বাঁকা ধরণের, যেন কষ্ট হয় বল্‌তে। আর সম্ভবত, যে শোনে, তা'র কষ্ট হয় আরো বেশি।

শ্রীলতা বল্‌লে, 'মিস্‌টর কার, ইনি পার্থপ্রতিম দে।'

'ডিলাইটেড!' মিস্‌টর কারের মুখের কোনো-এক কোণে যেন এতক্ষণ একটা হাসি লুকিয়ে ছিলো, এইবার তিনি ইসারা করতেই বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়্‌লো তাঁর সারামুখে। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বাড়িয়ে দিলেন তাঁর হাত; পার্থপ্রতিম সঙ্কুচিতভাবে তা'র অনভ্যস্ত হাত দিয়ে তা গ্রহণ কর্‌লে।

শ্রীলতার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় হ'লো। কেউ বল্‌লে, 'আপনি ভবানীপুরেই থাকেন বুঝি?' কেউ বল্‌লে, 'আপনিই কি মাঝে-মাঝে মাসিকপত্রে লেখেন?' কেউ বা কিছুই বল্‌লে না। কেউ তা'কে বিশেষ লক্ষ্য কর্‌লে না। সে তা আশাও করেনি।

একটু পরে শ্রীলতা, 'আমি একটু আস্‌ছি,' বলে' অন্তর্হিত হলো। মিস্‌টর কার তা'কে সঙ্গদান কর্‌লেন চায়ে। প্রথমবার প্যারিসে গিয়ে ভালো ফরাসি না জান্‌বার জন্য তাঁকে কী-কী বিপদে পড়্‌তে হয়েছিলো, সে গল্প বলে' তিনি পার্থপ্রতিমকে আপ্যায়িত কর্‌লেন। পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'ভারি মজা তো।'

চা হ'য়ে গেলো। মিস্‌টর কার গভীরভাবে মাথা নত করে' বল্‌লেন, 'Excuse me—I'll take a turn or two round…', বল্‌তে-বল্‌তে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'নিশ্চয়ই! আমার জন্যে আপনি ভাব্‌বেন না।'

দ্রুত পা চালিয়ে ভদ্রলোক একটু দূরে এক টেবিলে গিয়ে বস্‌লেন, যেখানে দুটি মহিলা তৃতীয় এবং অনুপস্থিত কোনো মহিলার প্রণয়-কাহিনী আলোচনা কর্‌ছিলেন। মিস্‌টর কার গিয়েই খুব ধারালো একটা মন্তব্য কর্‌লেন: উঠ্‌লো হাসির রোল।

প্রার্থপ্রতিম রইলো একা বসে'। অন্ধকার হ'য়ে এসেছে; কিন্তু পশ্চিমের আকাশে বর্ষা-সন্ধ্যার লাল মেঘ এখনো ফিকে গোলাপি। তা'র আশে-পাশের টেবিল থেকে ভেসে আস্‌ছে কথার গুঞ্জন। পার্থপ্রতিম শোন্‌বার চেষ্টা কর্‌লে। খুব বেশি চেষ্টাও কর্‌তে হ'লো না; চা-পরবর্ত্তী স্বগোষ্ঠী-সঙ্গজাত উৎসাহে প্রায় সবাই চেঁচিয়ে কথা কইছিলো। ঠিক তা'র পিছনে দুটি অত্যন্ত ক্ষীণাঙ্গ, দেখ্‌লে মায়া হয় এমন চেহারার যুবকের মাঝখানে এক ভদ্রলোক—জম্‌কালো, এবং একটু আত্ম-সচেতন তাঁর গোঁফ, মুখে তাঁর ছ'ইঞ্চি

লম্বা এক হাবানা—উচ্চস্বরে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ কর্‌ছিলেন বলে' মনে হ'লো।

'…ও একবার বলে সে-কথা?' পার্থপ্রতিম শুন্‌তে পেলো, 'একবার বলে? খুব তো দেখিয়ে বেড়ায় সবাইকে জাঁক করে', কিন্তু…' ভদ্রলোক চুরুটটা একবার চুষ্‌লেন, 'অমন taste ওর কখনো হবে! নিজে ডিজাইন করে' কত কত কষ্টে আমি আর্মি এণ্ড্‌ নেভিকে দিয়ে—' চুরুটে আবার টান, 'কিন্তু আমি যে ওকে দিয়েছিলুম খাটটা, ও একবার বলে সে-কথা?'

ক্ষীণাঙ্গ ছেলে দুটি গভীর সমবেদনাসূচক অস্পষ্ট শব্দ কর্‌লে।

'কী না করেছি আমি ওর জন্যে! ও আজ যেটুকু হয়েছে, তা হ'তে পেরেছে কা'র জন্যে। আমি যদি না থাক্‌তুম ওর পিছনে তা হ'লে সাধ্য ছিলো ওর—' আবার চুরুটে টান। ধোঁয়া।

'আজ যে ওকে দেখ্‌ছো, তড়্‌বড়্‌ করে' চলে, কথা বলে চট্‌পট্‌—সে-সব তো আমাকেই ওকে শেখাতে হয়েছে হাতে ধরে'। আগে একটা কথা বেরুতো না মুখ দিয়ে। প্রথম যখন ওকে নিয়ে গেলুম তপতীর কাছে, তপতী তো হেসেই খুন। আমাকে

বল্‌লে, "ওকে কেন ধরে' এনেছো?" আমি বল্‌লুম, "কেন, বেশ তো ছেলেটি।" তপতী বল্‌লে, "ও কি বস্‌তে জানে!" আমি যা-ই বলি নে কেন, কানেই তোলে না তপতী।'

ক্ষীণাঙ্গ ছেলেদের একজন বল্‌লে, 'সেই লোককেই তো শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে…'

'হ্যাঁ, বিয়ে কর্‌লে, কিন্তু সে কি ওর গুণে? *I* had to do the wooing for him. আমিই তপতীকে জিতিয়ে দিলুম ওকে; ও একা হ'লে এখনো সেই সতেরো টাকার স্যুট পরে' ঘুরে বেড়াতো ফ্যা-ফ্যা করে'। অথচ ও এখন সেই খাটের কথাটা পর্য্যন্ত একবার বলে না।'

ক্ষীণাঙ্গ ছেলেদের আর-একজন বল্‌লে, 'আশ্চর্য্য।'…

* * *

দুটি মেয়ে ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে পার্থপ্রতিমের পাশ দিয়ে চলে' গেলো।

'…রোজ দাঁড়িয়ে থাক্‌তো', একজন বল্‌ছিলো, 'জিমখানা ক্লাবের দরজায়। বাড়ি থেকে বেরোবার জো নেই ওর জ্বালায়।'

আর-একজন বল্‌লে, 'তুই ওকে একটা খোঁয়াড়ে দিয়ে দিলেই তো পার্‌তিস—যেখানে গোরু-ছাগল ভরে' রাখে।'

প্রথমা হেসে উঠ্‌লো। 'ছেলেটা দেখ্‌তে কিন্তু বেশ ছিলো। ভাব্‌ছিলুম…' তা'রা চলে' গেলো পার্থপ্রতিমের শ্রুতিপথের বাইরে।

* * *

পাশের টেবিলটা খালি ছিলো; কখন্‌ যে এক যুগল এসে সেখানে বসেছে, পার্থপ্রতিম লক্ষ্য করে নি। আবছায়ায় যদ্দূর মনে হ'লো, মহিলাটি বেশ লম্বা, অত্যন্ত শ্বেতাঙ্গী; আর সেই অঙ্গের যদ্দূর সম্ভব প্রকাশ কর্‌ছে তাঁর পোষাক। ব্যাপারটা শাড়িই বটে, কিন্তু এমন অদ্ভুত ফির্‌তি দিয়ে পরা যে পার্থপ্রতিমের সন্দেহ হ'লো, ইনি বাঙালি কিনা। এমন সময় মহিলাটি স্পষ্ট বাঙ্‌লায় বলে' উঠ্‌লেন, 'উঃ।'

সঙ্গের ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, 'কী হ'লো?'

'Oh, shut up.'

ভদ্রলোক বুজে গেলেন। চুপচাপ

খানিক পরে শ্বেতাঙ্গী বল্‌লেন, 'ললিত গেলো আমাদের সাম্‌না দিয়ে।'

'ওঃ, ললিত!'

'বেশ ছেলে ললিত—he's a nice boy.' শ্বেতাঙ্গীর বাঙ্‌লা কূল ছাপিয়ে ইংরিজিতে তরঙ্গিত হ'য়ে উঠ্‌লো, 'A nice boy. I used to be very fond of him.'

ভদ্রলোক নীরব।

'And he's a pretty wife, too. A lovely, little girl. She's a sweet face. A *sweet* face.'

'I do'nt see much in her, though.'

'Naturally, you being what you are.'

'I think I can know a pretty face when I see one.'

'A fat lot you think! But her face *is* sweet.'

'Well, if you come to it, she *does* seem to have a sort of a charm.'

'A sort of a—what?'

'Charm. She's rather charming in her own way, you know.'

'Lord! *you* talking of charm!'

'But did'nt you—'

'Oh, for Heaven's sake, do try to think for yourself…for a change.'

'I do think she's charming'.

'Fancy Lalit's wife being charming!' মহিলাটি মৃদু, চাপাস্বরে হেসে উঠ্‌লেন, 'Lord! Men *have* queer tastes.'

ভদ্রলোক আর কথা বল্‌লেন না। মহিলাটি একটা সিগ্রেট বা'র করে' ধরালেন। দেশলাইয়ের ক্ষণিক আলো তাঁর শ্বেত-পাণ্ডু মুখের উপর একটা রক্তাভা ফেলে মিলিয়ে গেলো। তারপর বল্‌লেন, 'Well, you needn't be so glum as all that. You needn't have…' মাঝখানকার কয়েকটা কথা শোনা গেলো না, 'if you can't keep up your spirits.'

নিঃশব্দে, ধূসরায়মান ছায়ায় ছায়ামূর্ত্তির মত শ্রীলতা এসে দাঁড়ালো তা'র সাম্‌নে। টেবিলের উপর এক হাত রেখে তা'র দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে' বল্‌লে, 'আপনি একেবারে একা বসে' আছেন, দেখ্‌ছি—'

শ্রীলতার আসন্ন অ্যাপলজিতে বাধা দিয়ে পার্থপ্রতিম বললে, 'না, একা আর কোথায়!' বলে' নিজের চারদিকে একবার তাকালো।

শ্রীলতা বল্‌লে, 'এতক্ষণ বড় ব্যস্ত ছিলুম সবাই-কেই খুসি কর্‌বার বিষম চেষ্টায়। কিছু মনে কর্‌বেন না—'

'মোটেও নয়। আপনি জানেন না, এতক্ষণ আমার কী চমৎকার সময় কাটছিলো।'

শ্রীলতা পাশের একটা চেয়ারে বস্‌লো। পাশের টেবিলের মহিলাটির অধরসংলগ্ন সিগ্রেটের প্রান্ত লাল একটা পোকার মত মুহূর্ত্তের জন্য ঈষৎ স্ফীতকায় হ'য়ে উঠে আবার ছোট হ'য়ে গেলো।

'I say', তাঁকে বল্‌তে শোনা গেলো, 'Why can't you *laugh* a little more? It would clear your soul of its fungousness.'

পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'নিজকে মনে হচ্ছিলো একটা দ্বীপের মত, চারদিকের সব বিচিত্র ঢেউ যা'র গায়ে এসে ধাক্কা খাচ্ছে।'

শ্রীলতা একটু হেসে বল্‌লে, 'এই সব বর্ব্বরদের ক্ষমা কর্‌বেন।'

'আজকালকার দিনে বর্ব্বর আমরা সবাই—কম কি বেশি। সভ্যতার বর্ব্বর।'

'আর, যে যা-ই বলুক্‌, সব জড়িয়ে ব্যাপারটা বেশ চোখ-ভোলানো গোছের। ঝলমল করে।'

'তা'রও বেশি—ধাঁধিয়ে দেয় চোখ। ঠাট্টা কর্‌বো ভীষণ, টুক্‌রো-টুক্‌রো করে' দেবো বিদ্রূপে, অস্ত্র করে' বা'র করে' দেখাবো ভিতরকার পচা শাঁস—আর এদিকে,

বাঁচ্‌বো তা'রই মধ্যে, তা'র বাইরে গেলেই বাঁচ্‌বো না—উপায় নেই আমাদের এ ছাড়া। বেশ মজা।'

'আর অত খুঁতখুঁত করে', নালিশ করে', প্রতিবাদ করে'—অবিশ্রান্ত ছট্‌ফট করে'ই বা লাভ কী? ইচ্ছে কর্‌লেই তো আমরা সুখী হ'তে পারি। নিজের মনেরই মধ্যে। বাইরের অবস্থা যা-ই হোক্—কী এসে যায়? পৃথিবীর কথা ভেবে খামকা আমরা মন-খারাপ কর্‌তে যাবো কেন?'

'পৃথিবীটা এক-এক সময় এমন জোরে ঢুঁ মারে এসে—'

শ্রীলতা হেসে উঠ্‌লো। 'এমন খারাপই বা কী আমাদের পৃথিবীটা—সব দিক ভেবে দেখ্‌তে গেলে।'

'না, বরং ভালোই তো,' পার্থপ্রতিম শ্রীলতার হাসির প্রতিধ্বনি কর্‌লে, 'বিশেষ, ভালো চায়ের পর সন্ধ্যার ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে' খুবই ভালো।'

এ-সব কথার আড়ালে তাদের দু'জনের মাঝখানে যেন সংস্পর্শ ফিরে আস্‌ছিলো—অলক্ষিত, উষ্ণ সঞ্চরণে যেমন রক্ত ফিরে আস্‌তে থাকে সদ্যরোগমুক্ত শরীরে। একটা নতুন সচেতনতা, সমীপতা তাদের মধ্যে জন্ম নিলো—সন্ধ্যার মর্মরিত অন্ধকারে, তারার প্রতীক্ষায় কম্পমান ম্লান-নীল আকাশের নিচে।

পাশের টেবিলের মহিলাটি হাতের সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেল্‌লেন। শূন্যে একটা লাল অর্দ্ধ-বৃত্ত এঁকে সেটা একটু দূরে গিয়ে পড়্‌লো। 'Lord!' ক্লান্তস্বরে তাঁকে বল্‌তে শোনা গেলো, 'If only one ...' তাঁর কথার বাকি অংশ অস্পষ্ট মর্ম্মরের ভিতর মিলিয়ে গেলো।

হঠাৎ গম্ভীরস্বরে ভদ্রলোকটি বলে' উঠ্‌লেন, 'Do you know, I shall perhaps kill you one of these days.' মহিলাটি তীক্ষ্ণ ও সংক্ষিপ্ত এক হাসি নির্গত কর্‌লেন।

দার্জিলিঙ্‌-ফেরৎ মেয়ে দু'টি ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে আবার তাদের সাম্‌নে এসে পড়্‌লো। একজন বল্‌ছিলো: '... শেষ পর্য্যন্ত ক্লান্তিকর। ভেবে দেখ্‌তে গেলে, চুপচাপ একা বসে' থাকাই সব চেয়ে ভালো।'

'তেমন কিছু খারাপ নয়, অন্তত—যদি একটা আয়না থাকে সাম্‌নে।'

'আয়না?'

'হ্যাঁ, জীবন্ত একটা আয়না, মুগ্ধ, বিহ্বল একটা আয়না, রক্তমাংসের একটা স্তব ...'

হঠাৎ শ্রীলতা বল্‌লে, 'আমার বন্ধুদের সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়? এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না।'

পার্থপ্রতিম একটু হাস্‌লো। 'কিন্তু তাদের ভিতর থেকে যে মোহ ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। আপনি জানেন তা।'

'এরা মেকি, এরা ফাঁকা, এরা মিথ্যে—এ-সব কথা কি আপনি মনে-মনে একবারও বলেন না ?'

'এটা তো সত্য যে এরা রঙিন। আর সেই রঙ্‌টাই মনে লাগে সব চেয়ে বেশি। একটানা বিবর্ণতার মধ্যে তা'রই জন্যে কৃতজ্ঞ থাক্‌তে হয়।'

কিন্তু ক্রমেই এরা ফ্যাশানের বাইরে চলে' যাচ্ছে। পাঁচ বছর আগে এদের যেটুকু মান ছিলো, এখন আর তা-ও নেই। আজকাল এদের অস্তিত্বটা কষ্টেসৃষ্টে সহ্য করা হচ্ছে মাত্র। আজকাল ঢেউ এসেছে আন্তরিকতার।'

'কিসের ?'

'আন্তরিকতার। মানে, সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত্ত পল্লী-প্রাণ। আপনাদের বাঙ্‌লা সাহিত্য পড়ে' বল্‌ছি।'

'আপনার দয়া।'

'না, দেখুন্', শ্রীলতার হাসিতে সন্ধির প্রস্তাব ফুটে উঠ্‌লো, 'ব্যক্তিগত কোনো কারণ না থাক্‌লে সাহিত্য কি দেশ কি জাতি ঐ রকম দূর ও অস্পষ্ট কোনো জিনিসের খাতিরে আমরা কখনো চটি নে।'

'কিন্তু কারণটা ব্যক্তিগত, সে-ইঙ্গিত কর্‌লে আমাদের

মানে ভয়ানক ঘা লাগে। আমি নিজের কাছে যে-রকম ভাণ কর্‌ছি, আপনি সেই ভাণটাকে চোখ বুজে মেনে চল্‌বেন। সেটাই ভদ্রতা।'

'শুধু ভদ্রতার জন্যে নয়, আত্ম-সম্মানের খাতিরে তা-ই কর্‌তে হয়—আপনি আমার ভাণটাকে মেনে চল্‌বেন, এই ভরসায়। যদি আমরা প্রত্যেকে অন্য-সবাইকে তলিয়ে দেখ্‌তে আরম্ভ করি, এবং সেই দেখাটাকে বল্‌তে থাকি স্পষ্ট করে,' তা হ'লে পোষাকি গোছের যা একটু বন্ধুতা আমাদের মধ্যে চল্‌তি—তাও লোপ পেয়ে যায়।'

'পোষাকি গোছের বন্ধুতা বল্‌লেন কেন?'

'তা নয় তো কী?'

'তোমার-জন্য-প্রাণ-দিতে-পারি গোছের বন্ধুতা না হ'লেই তা'কে উড়িয়ে দিতে হবে নাকি?'

'তা নয়। প্রাণ আজকালকার মানুষ সহজে দিতে চায় না—এমন কি, স্বদেশ কি ঈশ্বর গোছের মস্ত কথার জন্যেও নয়। কিন্তু বন্ধুতা—বন্ধু তাদেরকেই বল্‌বেন, মনে-মনে যা'রা পরস্পরকে তীব্র অপছন্দ করে, অথচ বাইরে যা'রা একত্র হয়, দৈবক্রমে তা'রা এক জাতের কি দলের বলে'—না হয় কোনো স্বার্থের খাতিরে।'

হ'লোই বা স্বার্থ। স্বার্থ হ'লেই সেটা খারাপ হবে কেন? দু'জন লোক যদি পরস্পরের সঙ্গে কথা কয়ে' সুখ পায়, সেটাও তো একরকম স্বার্থ।'

'কিন্তু বন্ধুতার ভিত্তি অন্যরকম হওয়া উচিত।'

'কী রকম? হৃদয়? ভালোবাসা? কিন্তু হৃদয় আমাদের কতদূরই বা নিয়ে যেতে পারে? আর ভালোবাসা? যদি প্রশংসা কর্‌বার, মুগ্ধ হবার কিছু না থাক্‌বে, তা হ'লে একজন সাবালক মানুষ আর-একজন অনাত্মীয় সাবালককে ভালোবাস্‌তে যাবে কেন?'

'শেষ পর্য্যন্ত একটু দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা থেকেই যায়—সম্পর্কটা ঠিক ব্যক্তিগত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না।'

'সে-ই তো ভালো। কারণ, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সেখানেই ক্ষয়।' পার্থপ্রতিমের তা'র মা-র কথা মনে পড়্‌লো। হৃদয়ের সব তীব্রতা—আর সেই তীব্রতার সব দুঃখ—পার্থপ্রতিমের পক্ষে তা'র মা-র মুখ তা'র প্রতিমূর্ত্তি। এমন সময় আস্‌তো, যখন সে-মুখের দিকে তাকাতে সে সহ্য কর্‌তে পার্‌তো না। তা ব্যাহত কর্‌তো তা'র নিজের সম্পূর্ণতাকে তা যেন তা'র নিজত্বের উপর অত্যাচার: যেখানে তা'র সত্তা আত্ম-নিহিত ও স্পর্শাতীত, সেখানেও তা নিতো পথ করে', ভেঙে দিতো তা'র অভ্যন্তরীণ

অখণ্ডতা। একটা অন্ধকার বন্যা, সেই তীব্রতা—অন্ধকারে উদ্যত, উজ্জ্বল খড়্গ—তা তা'কে আঘাত কর্‌তো, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে' দিতো তা'কে। সে চাইতো নিজকে ছিনিয়ে নিতে, সেই রুদ্ধশ্বাস বেদনা থেকে মুক্ত হ'তে, সম্পূর্ণরূপে নিজকে দখল কর্‌তে—আনন্দে, নিজের মধ্যে নিজে হ'য়ে ওঠ্‌বার আনন্দে। কিন্তু তা'র মনের প্রতি তন্তুতে জড়িয়ে গেছে সেই তীব্র চেতনা—তা আঁকড়ে ধরেছে তা'কে, উপায় নেই ছাড়া পাবার। 'না, ব্যক্তিগত দিক থেকে কাছে না-আসাই ভালো,' পার্থপ্রতিম আবার বল্‌লে, 'যে-মুহূর্ত্তে আমরা জড়িয়ে যাই, তখনই টানাটানি, ছেঁড়াছেড়ি; যেখানে এক হবার চেষ্টা, সেখানেই সংঘর্ষ, টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে যাওয়া। মানুষের সঙ্গে মানুষের নতুন একটা সম্পর্ক গড়ে' উঠ্‌তে পারে—বিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছন্ন, যা'তে সে মুক্ত থাক্‌বে, জমে' উঠ্‌তে পার্‌বে নিজের মধ্যে নিবিড় হ'য়ে, নিজকে অবিশ্রান্ত খরচ করে' ফেল্‌তে হবে না।'

'কিন্তু নিজকে একেবারেই খরচ কর্‌বেন না, এ-ই বা কী অন্যায় জেদ।'

পার্থপ্রতিম মুখ তুলে একটু হাস্‌লো, কোনো কথা বল্‌লে না। লঘু অন্ধকারে ভরে' গেছে বাগান, কালো

একটা পর্দ্দার মত তা হাওয়ায় দোলায়িত হ'য়ে উঠ্‌ছে। পাশের টেবিল থেকে যুগল একটু আগে উঠে গেছে; কাছাকাছি কেউ নেই; অতিথির ভিড় কম্‌তে-কম্‌তে এখানে-ওখানে ছড়ানো হু'চারজনে এসে ঠেকেছে। পার্থপ্রতিম অনুভব কর্‌লো, তা'রও এখন ওঠা উচিত। শ্রীলতার দিকে সে একবার তাকালো, সে আছে মুখ ফিরিয়ে। অন্ধকারে শুভ্রতরো তা'র মুখ, তা'র ছাই-রঙের শাড়ি গেছে হারিয়ে। কত দূর—এরই মধ্যে, এই মুহূর্ত্তের নীরবতার অবকাশে কতদূরে সে সরে' গেছে, তা'র গ্রীবার বাঁকা রেখায় কী হুরূহ নির্লিপ্ততা। একটু আগে পার্থপ্রতিম কোনো-কোনো কথা বলেছিলো, যা মনে করে' সে প্রায় হুঃখিত হ'লো। কেন সে বল্‌তে গিয়েছিলো ও-সব কথা? সে একটা সাধারণ নিয়ম ঠিক করে' রেখে-ছিলো—যে-সব জিনিস সে ভাবে নিজের মনে, ঢিলে আলাপের প্রসঙ্গে তা কখনো বল্‌বে না, কেননা, তা বোঝানো শক্ত, যদি না অন্য পক্ষের মনে সেই কথাই থেকে থাকে ভ্রূণাবস্থায়। প্রতিদিনের সামাজিক প্রয়োজন সে চালিয়ে দেবে খুচ্‌রো আলাপে। সে-কথা আমার মনের কথা, তা কারো কাছে বলা নিজকে নগ্ন কর্‌বার মত, প্রায় নিজেরই উপর কোনো

অত্যাচার কর্‌বার মত। সব চেয়ে ভালো নিজকে উন্মোচন না করা, সব চাইতে নিরাপদ নিজের চারদিকে আবরণ।

'আপনি যদি,' হঠাৎ শ্রীলতা বলে' উঠ্‌লো, 'নিজকে দূরে সরিয়ে রাখেন, তা হ'লেই লোকে আরম্ভ কর্‌বে আপনাকে দোষ দিতে—বল্‌বে, আপনি আন্তরিক নন্‌।'

পার্থপ্রতিম চম্‌কে উঠ্‌লো। তা'রই চিন্তার যেন সে শুন্‌তে পেলো প্রতিধ্বনি। কিন্তু তখনই তা'র মনে পড়্‌লো, একটু আগে সে-কথা হ'য়ে গেছে—তা'রই জের টান্‌ছে শ্রীলতা। কিন্তু ও-বিষয় নিয়ে আর বেশিদূর যাবার ইচ্ছে তা'র ছিলো না; সে শুধু বল্‌লে, 'হ্যাঁ, আমাদের দেশের লোক অন্তত গলে'-যাওয়া স্বভাব বড় বেশি পছন্দ করে।'

তা করে, কথাটা বলে'ই পার্থপ্রতিম ভাব্‌তে লাগ্‌লো, অনেক পরিচয় সে তা'র পেয়েছে। এক রকমের গায়ে-পড়া, দাদা-ভাই গোছের বাঙালিয়ানা আছে, যেটাকে স্বজাতি-চরিত্রের একটা প্রধান লক্ষণ বলে' আমরা সগর্ব্বে ঘোষণা করে' থাকি। আমরা গরমের দেশের লোক, রীতি-পালনের কাঠিন্য আমাদের বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। আমাদের বৈষ্ণব দেশ—লুটিয়ে পড়্‌তে না পার্‌লে, ঢলাঢলি কর্‌তে না পার্‌লে

আমাদের শান্তি নেই। আমাদের কোনো আব্রু নেই; এক কথায় আমরা একজনকে অন্তরঙ্গ করে' তুলি; যে আসছে, তা'র কাছেই আমরা উচ্ছ্বসিত, কারো কাছেই নিজকে প্রদর্শন করতে আমাদের সঙ্কোচ নেই। সবখানেই আমরা ছড়িয়ে আছি, অকারণে এবং অনায়াসে হৈ-হৈ করছি; ও-ব্যক্তি যে আমার বন্ধু, তা দামামা পিটিয়ে চারদিকে রটিয়ে দিয়ে মনে করছি, বন্ধুতা আরো বেশি গাঢ় হ'লো। যে-ব্যক্তি সব চেয়ে বেশি চীৎকার করতে পারে, সে-ই, আমাদের মতে, সব চেয়ে হৃদয়বান; যে-ব্যক্তি সব চেয়ে বেশি সংখ্যক লোকের সঙ্গে সব চেয়ে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে' মাখামাখি করতে পারে, তা'র মত ভালো লোক আর নেই। আমাদের জাতের মধ্যে সঙের ভাবটা বেশ স্পষ্ট ও স্থূল; যে-কোনো ব্যাপার নিয়েই সঙ্‌পনা না করতে পারলে আমরা ঠিক সুখী হ'তে পারি নে।

'আপনার, আর যা-ই হোক্,' শ্রীলতা বললে, 'গলে' যাবার কোনো ভয় নেই। বরং যাদের গলবার ধাঁচ, তা'রা আপনার সান্নিধ্যে জমে' যেতে পারে।'

'এতটা খারাপ নয়, আশা করি,' পার্থপ্রতিম হেসে উঠলো। তারপর প্রসঙ্গ-পরিবর্তন করলে, 'এখন যেতে হয়। অনেক ধন্যবাদ ইত্যাদি।'

'আপনি এখানে এসে খুব বেশি বিরক্ত হন্‌ নি, আশা করি।'

'আপনার সঙ্গে ভালো করে' আলাপ কর্‌বার ইচ্ছে আমার বরাবরই ছিলো।'

'দার্জিলিঙে একবার এলেই তো পার্‌তেন', পার্থপ্রতিমের সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীলতাও উঠে দাঁড়ালো, 'কয়েকটা দিন ভারি স্থন্দর ছিলো।'

পার্থপ্রতিম কোনো কথা বল্‌লে না; একটু সময়, দুজনে নীরবে হেঁটে চল্‌লো। তারপর শ্রীলতা বল্‌লে, 'যদি বলি, মাঝে-মাঝে আস্‌বেন? ভালো হয় তা হ'লে।'

'আস্‌বো।'

'একসঙ্গে একটু পড়াশুনো করা যাবে—যদি কিছু মনে না করেন।'

'সে তো আনন্দের কথা।'

'মাঝে-মাঝে এমন ভয় করে পরীক্ষার জন্য—জানেন না। ঠিক আস্‌বেন তো?'

'ঠিক।'

পার্থপ্রতিম তা'র কথা রাখ্‌লে। পরের সপ্তাহে সে একদিন গেলো শ্রীলতার বাড়িতে। দু' ঘণ্টা ধরে' তা'রা আলোচনা কর্‌লে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজি গীতিকবিতা।

কবিতা

একদা এক পুরুষের স্বপ্নের মধ্যে জড়িয়ে গেলো এক মেয়ের চুল; জেগে উঠে সে দেখ্‌লে, নরম চুলের স্বাদে ভরে' গেছে তা'র মুখ; মনে-মনে সে বল্‌লে, 'ঈশ্বর, তা'কে দাও, আমায় তা'কে দাও।' তা'র ফলে পাল উঠ্‌লো নৌকোয়, দিগন্ত থেকে দিগন্তে সমুদ্র উঠ্‌লো কেঁপে, লাগ্‌লো আগুন, ট্রয় ছাই হ'লো পুড়ে।

এ-ই তো গল্প। এ-গল্প চলে' এসেছে চিরকাল, সময়ের মরুপ্রসার পার হ'য়ে, শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রতিধ্বনিত হ'য়ে কোটি-কোটি মৃত্যু অতিক্রম করে' ঢেউ তুলে গেছে মানুষের মনে। কোথায় সেই ট্রয়; কোথায় বা সে-মেয়ে, দেবীর কাছে যে উপঢৌকন নিয়ে যাবে নিজের বুকের ছাঁচে গড়া পেয়ালা—তবু আগুন ধরে স্বপ্নের অন্ধকারে, বাসনার সমুদ্রে ওঠে ঝড়, চূর্ণ হ'য়ে ভেঙে যায় কত হৃদয়—হতাশায়, উন্মাদনায়।

আমার এ-গল্পকে আমি নিয়ে যেতে পার্‌তাম সেই রোমাঞ্চিত আকাশে, সঙ্ঘর্ষের ফেনিল আবর্তে, দুঃসাহসের দুরূহ সঙ্কল্পে, দুঃখের চরমে। কিন্তু না চাইলে পাওয়া

যায় না ; পার্থপ্রতিম যদি তা চায়ই না—সেই দুঃখের বিদ্যুৎস্পর্শ, অন্ধকারের রহস্য-মর্ম্মর—পার্থপ্রতিম যদি তা চাইতেই না পেরে থাকে, তা হ'লে কী করে' সে তা পাবে, কী করে' তা টেনে আন্‌বো এই গল্পে? না, এই গল্পকে চল্‌তে হবে তা'র নিজের পথে, শান্ত স্রোতে, ঘূর্ণির সঙ্কট বাঁচিয়ে, সর্ব্বনাশের লুকোনো শিলা এড়িয়ে। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগ্‌লো, পার্থপ্রতিম ভুলে'ই গেলো চাইতে।

এ-কথা ঠিক যে পার্থপ্রতিম গভীর আনন্দ পেতো, যতক্ষণ সে থাক্‌তো শ্রীলতার সঙ্গে ; সে ভালোবাস্‌তো সেই ছোট, নীল রঙের ঘরে থাক্‌তে—বাইরের আকাশ যখন ফেটে পড়্‌ছে লাল আর সোনায়, একটি আলোর রেখা হয়-তো লুটিয়ে পড়েছে শ্রীলতার উজ্জ্বল-কালো চুলে—ভালোবাস্‌তো সেই শান্ত, কোমল আবহাওয়া, মৃদু-মর্ম্মরিত কবিতায় ঢেউ-খেলানো—গ্রীষ্মের দীর্ঘ, সোনালি গোধূলি ভরে', দিনের আশ্চর্য্য মৃত্যুর মাঝখান দিয়ে—যতক্ষণ না ঘনায়মান ধূসরতায় ছাপার অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হ'য়ে আস্‌তো, শ্রীলতা হঠাৎ তাকাতো মুখ তুলে, একটা কথা বল্‌বার মাঝখানে পার্থপ্রতিম চুপ করে' যেতো। শ্রীলতার আনত মুখ একটা অস্পষ্ট শুভ্রতা, তা'র কালো চুলের মাঝখান

দিয়ে ঋজু, দীর্ঘ সিঁথি একটা চিহ্নের মত, দূরের সঙ্কেতের মত—তা'র যে উপস্থিতি, তা-ই যেন একটু দূর, নৈর্বক্তিক; যেন তা আদৌ শারীরিক, বাস্তব নয়, বরং কল্পনার একটা চেতনা। ঘরের ম্লান-হ'য়ে-আসা আলোর নিটোল সম্পূর্ণতাকে তা নষ্ট করে' দিতো না, তা এক হ'য়ে যেতো সেই গভীর নীরবতার সঙ্গে, তা যেন বাইরের কোনো জিনিস নয়, সেই সন্ধ্যা-সত্তারই একটা অংশ। টেবিলের উপর লঘুভাবে অবস্থিত শ্রীলতার হাত দু'খানি যেন করুণায় স্তব্ধ, তা'র ছড়িয়ে-যাওয়া শাড়ির আঁচল একটা প্রশান্তি।

আর পার্থপ্রতিম নিজকে সুখী মনে কর্‌তো—কবিতার রসে নিবিড় সেই সময়! প্রতি মুহূর্ত্ত একটি পরিপূর্ণ আঙুরের মত, যা'র ভিতরে রয়েছে দীর্ঘ সাধনার সূর্য্য, ক্ষীণতম স্পর্শে ফেটে যাবার জন্য প্রস্তুত। ফেটে যেতে—মধুরতায়, উষ্ণ সূর্য্য-স্বাদে। সেই সূর্য্য-স্বাদ প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি মুহূর্ত্ত যেতে-যেতে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে তা'র সূর্য্যের ঐশ্বর্য্য। সেই সময়ের মধ্যে পার্থপ্রতিম হ'য়ে উঠ্‌তো সম্পূর্ণ, তা'র মন ছাড়া পেতো কবিতার রঙিন আকাশে, নিজকে সে দিতে পার্‌তো তা'র ভিতর দিয়ে, নিজকে প্রকাশ কর্‌তে পার্‌তো। গোধূলি রঙিন হ'য়ে উঠেছে স্বচ্ছ মদের মত, তা'র মধ্যে সে

কবিতা পড়্ছে, রঙিন মদের মত কবিতা—এর বেশি আনন্দ আর কী থাক্তে পারে, পার্থপ্রতিমের পক্ষে? কারণ, কবিতা তা'র জীবনের চরম উৎসাহ, তা'র এক আত্ম-গ্রাসী নেশা হচ্ছে কথা। কথা, অনেক দিন সে নিজের মনে ভেবেছে, কী আশ্চর্য্য জাদু এই কথার। যেন আলাদিনের মায়া-প্রদীপ এসেছে তা'র হাতে; একবার স্পর্শ, আর বাণীরূপী জিন নিয়ে আস্বে গূঢ়তম রহস্যের সন্ধান। কথার সঙ্গে কথার ঘর্ষণে জ্বলে' উঠেছে আগুন, স্পর্শে-স্পর্শে বিদ্যুৎ, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সঙ্গীত। এই তো সব ছোট-ছোট কথা আছে পড়ে' কে ফিরে তাকাবে এদের দিকে, প্রতিদিনকার ব্যবহারের অভ্যাসে এরা মলিন—কেউ এসে তাদের তুলে নিলে, দিলে তাদের গায়ে নতুন ছাপ, সাজালে তাদেরকে বিশেষ এক রকমে—আর অম্‌নি, হঠাৎ আলো উঠ্‌লো জ্বলে' অন্ধকারে, কথা কয়ে' উঠ্‌লো রাত্রির অরণ্য। কথা: একটা সম্মোহন, উন্মাদনা, যা'র টানে হৃদয় কূল থেকে কূলে উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে খরস্রোতে। সেই স্রোত ছড়িয়ে পড়্‌তে চায় চারদিকে, নিজের মধ্যে তা'কে আবদ্ধ রাখ্‌তে গেলে তা সঙ্কীর্ণতায় ব্যথিত হয়। তখন মন চায় কথা কইতে: অন্য কাউকে বল্‌তে না পার্‌লে আনন্দের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় না।

কথিত আছে, কেউ যখন কোনো জিনিস লেখে, তা'র তৃপ্তি হয় না যতক্ষণ না অন্য কাউকে তা পড়াতে পারে। কিন্তু মানুষের আত্ম-প্রকাশের ইচ্ছার সঙ্গে মিশে আছে আত্ম-গোপনের প্রবৃত্তি: নিজের লেখার সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতই সঙ্কুচিত, নিজের কোনো লেখা কাউকে দেখানো আর তা'র কাছে মনের কোনো গভীর সঙ্গোপন অংশ উন্মোচন করা একই কথা। সেখানে আছে লজ্জার বাধা। তবু মন চায় অন্য-কোনো মনের সঙ্গে সংস্পর্শ: জান্‌তে ইচ্ছে করে, আমার এই কথা ঠিক ঝঙ্কার তুল্‌বে কিনা অন্য-কোনো মনে: আমার মধ্যে যা অর্দ্ধ-প্রকাশিত, ইঙ্গিতে ছায়াময়, তা যদি অন্য-কোনো মনের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পূর্ণতা লাভ করে, সেই সার্থকতা খোঁজে মন। আরো কত বেশি প্রবল—কারণ নিঃসঙ্কোচ—যে-লেখা আমার নিজের ভালো লেগেছে, তা অন্য-কাউকে পড়াবার ইচ্ছা: যদি এমন আর-একজন পাই যে তা থেকে ঠিক একই আনন্দ পেয়েছে, তা হ'লে তা'র উপভোগের মধ্যে নিবিড়তরো করে' পাই আমারই অন্তরের রস। বস্তুত, আমার যে-জিনিস ভালো লাগ্‌লো, তা'কে যেন আমি সম্পূর্ণ করে' পেতেই পারি নে, যতক্ষণ না অন্য-একজনের তা ভালো লাগে। পরম উৎসাহে, তাই, তা'কে নিয়ে যাই অন্য-

একজনের কাছে ; মনে-মনে থাকে ভয়, পাছে তা'র মন অপ্রস্তুত থাকে, ঘুমিয়ে থাকে, পাছে ঠিক জায়গায় ধাক্কা না লাগে। আমার উপভোগের বস্তু যদি লাঞ্ছিত হয় তা'র কাছে, সে যেন আমারই লজ্জা,অপমান— সে-দুঃখ কঠিন হ'য়ে বাজে। আর যদি ভাগ্য হয় প্রসন্ন, যদি খুসি ওঠে উচ্ছল হ'য়ে তা'র মনেও—কী আনন্দ! তা যেন আমারই একটা জয়, গৌরব। নিজের লেখার বিরূপ সমালোচনা শোন্‌বার চাইতে প্রিয় কবির অপমান সহ্য করা কম দুঃখের ব্যাপার নয়। আর, আমার প্রিয় কবিকে যদি কেউ ভালোবাসে, মন তা'র প্রতি ঝুঁকে পড়ে কৃতজ্ঞতায় ; মনে হয়, আমাকেই সে যেন মস্ত খাতির কর্‌লো।

পার্থপ্রতিম তা'র জীবন মোটামুটি একা কাটিয়েছে : তা'র মধ্যে গর্ব্ব আর লাজ্‌কভাবের এক অদ্ভুত মিশ্রণ সাধারণ সব সংসর্গ, সান্নিধ্য থেকে তা'কে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলো। বাড়িতেও তা'র কোনো ভাই কি বোন ছিলো না—তা'তে তা'র নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌বার অভ্যেস আরো বেশি প্রশ্রয় পেয়েছিলো। সে একটা জাদু-করা গোছের জীবন কাটিয়ে এসেছে—তা'র নিজস্ব এক পৃথিবীতে, স্বেচ্ছা-বন্দী। তা'র একমাত্র মুক্তি ছিলো তা'র লেখা ; অবরোধের যে-বাষ্প বিষাক্ত হ'য়ে

উঠ্‌তে পার্‌তো, লেখারই ভিতর দিয়ে তা নির্গত হ'তো, তা'তে করে'ই সে নিজকে দিতো বহির্জগতকে। কিন্তু লেখার ভিতর দিয়ে মনের একরকমের পরিতৃপ্তি হয় মাত্র; এমন সময় আসে, যখন আমরা চাই আরো প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিক কোনো সংস্পর্শ। এমন লোক ছিলো না, যা'র কাছে পার্থপ্রতিম তা'র সাহিত্যিক দেবতাদের স্তুতি করে' শান্তি পেতে পার্‌তো; তা'র সব আনন্দের উচ্ছ্বাস নিপীড়িত হ'তো তা'র নিজেরই মনের পরিসীমায়। তা'র মনের মধ্যে জমে' উঠ্‌তে থাক্‌তো অনেক কথা, অনেক তীব্র উপভোগ—একটা ভারের মত কিছুকাল, উন্মুখতায় ধৈর্য্যহীন—যতক্ষণ না তা হারিয়ে যেতো বিস্মৃতিতে। এমন সময় শ্রীলতার সাহচর্য্যে তা ছাড়া পেলো: পার্থপ্রতিম পার্‌লো কথা কইতে—আরো, আরো, আরো কথা। এমন একটা মনের কাছে সে এলো, যা, সে অনুভব কর্‌লো, তা'রই ধরণের—আর তা'র উৎসাহ গেলো কূল ছাপিয়ে। উজাড় করে' সে ঢেলে দিলে বহুদিনের সঞ্চিত আনন্দ, নতুন করে' তা'র ভালো লাগ্‌লো পুরোনো সব জিনিস—যা, সে ভেবেছিলো, অভ্যাস ফেলেছে জীর্ণ করে'। যখনই আমরা কাউকে তা বল্‌বার চেষ্টা করি, তখনই আমরা বুঝ্‌তে পারি, কোনো-একটা জিনিস আমাদের কত ভালো লাগে।

আর, শ্রীলতাও যে আনন্দ পাচ্ছে, এই চেতনা প্রতি মুহূর্ত্তে দোলা দিয়ে যেতো তা'র আনন্দকে। সেটা একটা পরিপূর্ণতা, যা পার্থপ্রতিম এই প্রথম জান্‌লো। সে যেন ফুটে উঠ্‌লো—কোনো গোপন প্রাণশক্তির আকস্মিক ঠেলায়। আর, নিজকে সে ঝরিয়ে দিতে লাগ্‌লো কথায়, অজস্র কথায়, অশান্ত, উত্তেজিত, উদ্দীপিত কথায়। দীর্ঘ সব সন্ধ্যা ভরে,' মুহূর্ত্তের পর সোনালি মুহূর্ত্ত, সে-ই কইলো কথা—শ্রীলতা বেশির ভাগ মনে-মনে অবাক হ'য়ে চুপ করে' রইলো।

দু'জন মানুষের পরস্পরের কাছে আস্‌বার দুটো পথ আছে: এক হৃদয়ের দিক থেকে—যখন একজন আর-একজনকে বলে, 'তোমাকে ভালোবাসি,' এবং তা'র পরে আর-কোনো কথা বল্‌বার থাকে না। সেটা আমাদের রক্তের মধ্যে কোনো আকর্ষণ—সেটা আমরা ইচ্ছে কর্‌লেই পেতে পারি নে, ইচ্ছে কর্‌লেই এড়িয়ে যেতে পারি নে। আমাদের চেয়ে প্রবল, তা আমাদের আঁক্‌ড়ে ধরে কঠিন মুঠিতে। হঠাৎ জেগে ওঠে রক্তের প্রতি রক্তের ক্ষুধা, আর সমস্ত সৃষ্টি কুয়াশায় মিলিয়ে যায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের এটা আদিম সম্পর্ক। এটা সহজ; এত সহজ বলে'ই কঠিন এর সিদ্ধি: মুখে আমরা এর স্তব করি, কিন্তু এর নাম করে' যা

সম্পন্ন করি জীবনে, নিছক দৈব-সংঘটিত চর্ম্ম-সম্পর্ক ছাড়া তা কিছু নয়। আর, দু'জন মানুষ মিলিত হ'তে পারে বুদ্ধিতে—রুচির ঐক্যে, কোনো উদ্দেশ্যের সমতায়। দু'জনের মনের ধর্ম্ম এক হ'তে পারে; তখন তা'রা আস্‌বেই—যদি তা'রা পরস্পরকে জান্‌বার সুযোগ পায়—পরস্পরের কাছে। দু'জনের হ'তে পারে এক পৃথিবী, দু'জনে পরস্পরকে সহায়তা কর্‌তে পারে নতুন পৃথিবী তৈরি কর্‌তে; চেতনার গভীরতায়, দু'জনের হ'তে পারে এক জীবন। এ-সম্পর্ক ব্যক্তিগত নয়; এতে গা-ঘেঁষাঘেষি নেই, আসক্তির নিরবকাশ ঘনতা নেই; এতে আছে মুক্তি, আছে নীরবে নিজত্বে ফুটে ওঠা। এটা একটু দূর, একটু নির্লিপ্ত—কিন্তু এ-ও একরকমের অন্তরঙ্গতা।

বর্ষার সুর

এরই মধ্যে এক বিকেলে নিবিড় হ'য়ে মেঘ করে' এলো, যেন একপাল বুনো হাতি ছাড়া পেয়েছে আকাশে। ছুট্‌লো হাওয়া; রাস্তার সব ধূলো ঝেঁটিয়ে জড়ো করে' কেউ যেন আছ্‌ড়ে ফেল্‌লে দু'পাশের বাড়িগুলোর গায়ে। বিয়ে-বাড়ির লোকদের মত

আকাশে মেঘেদের বড় ব্যস্ত ভাব—ছুটোছুটি, কানাকানি, হাঁক-ডাক চল্‌ছে অশ্রান্ত, যেন আয়োজন চল্‌ছে কোনো বিরাট সমারোহর। ছায়া নাম্‌লো পৃথিবীতে; গোধূলি-আচ্ছন্ন, স্বপ্নময় নতুন এক পৃথিবী—তা থেকে আমাদের ব্যবহারিক জগতের সব পরিচয়-চিহ্ন লোপ পেয়ে গেছে। কাচের শার্সি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পার্থপ্রতিম তা'র বাড়ির সাম্‌নের পুরোনো, পরিচিত রাস্তাকে ঠিক চিন্‌তে পার্‌লে না।

হঠাৎ হাওয়া থেমে গেলো: অদ্ভুত স্তব্ধতা একটা প্রাণময় উপস্থিতির মত। সমস্ত আকাশ প্রত্যাশায় রুদ্ধশ্বাস। আয়োজন সম্পূর্ণ হ'লো, এবার হবে আবির্ভাব। দুরন্ত মেঘগুলো চুপ করে' শুন্‌ছে কান পেতে। সে আস্‌ছে। আর দেরি নেই: সে এলো বলে'।

আর হঠাৎ তা ভেঙে গেলো, সেই রুদ্ধতা, কানে-কানে-টানা ধনুকের ছিলার মত তীব্র প্রত্যাশা। যেন বিশ্বের অন্তরের কোনো কঠিন বস্তু গলে' গেলো, বাতাসে বইলো ঠাণ্ডা স্রোত। তা'র স্পর্শে পার্থপ্রতিমের মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত শির্‌শিরিয়ে উঠ্‌লো। ওর ভিতরেও যেন হঠাৎ ছিঁড়ে গেলো কোনো গিঁট, খুসির বান ডেকে গেলো ওর মনে, ও ভেসে গেলো, ডুবে গেলো,

প্লাবিত হ'য়ে গেলো খুসিতে। কেন এই খুসি, তা ও জানে না। এর কোনো কারণ নেই; এ উঠ্‌ছে তা'র ভিতর থেকে উৎসের মত, ঝরে' পড়্‌ছে তা'র উপর অবাধ, উপ্‌চে যাচ্ছে তা'কে ছাপিয়ে। কী করতে হবে একে নিয়ে তা'র কোনো দিশে নেই। তা'র অন্তরের গভীর, ঐশ্বর্য্যময় নিঃসঙ্গতা তা'কে আচ্ছন্ন করেছে; এক বিশাল মুক্তি, নিজের সঙ্গে নতুন, সম্পূর্ণ মুখোমুখিত্ব। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি কোনো শক্ত স্বচ্ছ জিনিষের মত এসে লাগ্‌লো জান্‌লার কাচে, আরো বেশি অন্ধকার হ'য়ে এলো ঘর, পার্থপ্রতিম বসে' রইলো স্তব্ধ হ'য়ে। ওর মন মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো ছন্দে, বিদ্যুৎ-চকিত অন্ধকারের গর্ভ থেকে উৎসারিত হচ্ছে কথা; তারে-তারে, স্নায়ুতে-স্নায়ুতে ও ঝঙ্কৃত হচ্ছে। এই হচ্ছে কবিতার মুহূর্ত্ত, এ-মুহূর্ত্তকে নিজকে না দিয়ে উপায় নেই। পার্থ-প্রতিমের চৈতন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে কথার রাশি—অজস্র, এলোমেলো; ছড়িয়ে যাচ্ছে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে, কথা হারিয়ে গিয়ে শুধু গুঞ্জন করে' বেড়াচ্ছে ছন্দটা। ও যেন মনে-মনে পড়ে' যাচ্ছে অন্য-কারো লেখা কবিতা, সবটা মনে পড়্‌ছে না—মনে না পড়্‌লে ছেড়ে দিচ্ছে। ওর এখনো সাহস হচ্ছে না কাগজ-

কলম নিয়ে লিখ্‌তে বস্‌তে, পাছে তা'তেই এই মোহ যায় ভেঙে। যেটুকু প্রকাশ হয়, তা'র আড়ালে থাকে যে-কল্পনার অদৃশ্য বিশালতা, তা'রই অলোড়ন চল্‌ছে ওর মনে।

দ্রুত পরম্পরায় আরো কয়েকটা বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা বেজে উঠ্‌লো গানের টুক্‌রোর মত। সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন দরজায় মৃদু টোকা দিলে। পার্থপ্রতিম খেয়াল কর্‌লে না। একটু পরে আবার ধাক্কা—এবার বেশ জোরে। কেউ—নিশ্চয়ই। ঠিক এই সময়ে কেউ না এলেই সে খুসি হ'তো। উঠে গিয়ে সে দরজা খুল্‌লে। অবাক হ'য়ে গেলো শ্রীলতাকে দেখে।

'আপনি!'

'উঃ, ঠিক সময়ে এসে পড়া গেছে।' কথা বল্‌তে গিয়ে শ্রীলতা হাঁপিয়ে উঠ্‌লো। তা'র জোরে-জোরে নিঃশ্বাস পড়্‌ছে, চোখ ঝল্‌সাচ্ছে, চুলগুলো হাওয়ায় আর ধুলোয় এক কাণ্ড। তা'র ফিকে হল্‌দে শাড়িতে এইমাত্র পড়েছে যে বৃষ্টির ফোঁটা, তা ফুটে রয়েছে কালো ছোপের মত। স্পষ্টত, অনেকটা পথ সে দ্রুত হেঁটে এসেছে। পার্থপ্রতিমের অনুরোধের জন্য অপেক্ষা না করে'ই সে ঢুকে পড়্‌লো ঘরের মধ্যে। একটু পরে ঝম্‌ঝম্‌ করে' এসে পড়্‌লো বৃষ্টি।

শ্রীলতা বল্‌লে, 'বাঁচ্‌লাম।'

পার্থপ্রতিম তা'র উস্‌কোখুস্‌কো, ধূলো-রঙিন চুলের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'কোথায় যাচ্ছিলেন এ-বৃষ্টিতে?'

'যাচ্ছিলাম না—ফির্‌ছিলাম। ট্র্যামের রাস্তা থেকে দু'মাইল দূরে বাড়ি নেবার এই শাস্তি। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেও পৌঁছনো গেলো না—বাধ্য হলুম মাঝ-রাস্তায় আশ্রয় নিতে। ভাগ্যিস আপনার বাড়িটা ছিলো।' শ্রীলতা ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লো, 'আপনার কোনো অসুবিধে কর্‌লুম না তো?'

'ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঈশ্বরকে এই বৃষ্টির জন্য। যদি আজ এ-সময়ে বৃষ্টি না আস্‌তো, যদি আপনি বাড়ি থেকে না বেরোতেন, কি গাড়ি নিয়ে বেরোতেন, কি আপনার সঙ্গে থাক্‌তো বর্ষাতি—' পার্থপ্রতিম মৃদুস্বরে হেসে উঠ্‌লো, 'বিপন্ন নারীকে উদ্ধার কর্‌বার এমন সুযোগ জীবনে আর আস্‌বে না। নিজকে দস্তুরমত ছোটখাটো একটি সেইণ্ট্‌ জর্জ্জ্‌ মনে হচ্ছে: এখন ভদ্রগোছের এক-আধটা ড্র্যাগন পেলে বল্লমের দু'-খোঁচায় সাবাড় করে' দিয়ে তৃপ্তিলাভ কর্‌তে পারি।—কিন্তু বসুন। অন্ধকার লাগ্‌ছে কি? আলোটা জেলে দেবো?'

বৃষ্টির জলে ধূসরায়িত জান্‌লার কাচের দিকে তাকিয়ে শ্রীলতা বল্‌লে, 'না, থাক্‌। মুখ দেখবার পক্ষে যথেষ্ট আলো আছে।' নিচু একটা বেতের চেয়ারে সে বস্‌লো, 'চমৎকার—এই বৃষ্টি। ইলেক্‌ট্রিক আলোয় কেন তা'কে নষ্ট করে' দেবেন?'

'হ্যাঁ, চমৎকার—যদি না এমন হয় যে আপনি রাস্তায় আছেন।—ঠিক কথা আপনি ভিজে যান্‌ নি তো? বদ্‌লাবেন?' বলে'ই পার্থপ্রতিমের মনে পড়্‌লো যে তা'র সমস্ত বাড়ি তন্ন-তন্ন করে' খুঁজ্‌লেও আধ-খানা পাড়ওয়ালা শাড়ি পাওয়া যাবে না।

'না, না, মোটেও ভিজি নি। দু'এক ফোঁটা জল যা পড়েছিলো, শুকিয়ে গেছে। আপনি বসুন।'

'হয়-তো আপনি একটু চা—'

'চা আমি এই একটু আগে খেলুম। এখন আর নয়। আপনি যদি এত ভদ্রতা করেন, তা হ'লে—' শ্রীলতার মুখে যা এসে পড়েছিলো, তাড়াতাড়ি সে তা সাম্‌লে নিয়ে চুপ করে' গেলো।

'তা হ'লেই বা কী? রোজ তো আর ঠিক আমার বাড়ির দরজায় এমন সুবিধেমত বৃষ্টি নাম্‌বে না।' পার্থপ্রতিম বুঝ্‌তে পার্‌লে যে কথাটা তা'র বলা উচিত হয় নি; কেউ যদি কোনো কথা না

বল্‌তে চেয়ে থাকে, সেটা বুঝ্‌তে পার্‌লেও তা'কে বুঝ্‌তে দেয়া উচিত নয় যে বুঝেছি। কিন্তু তা'র মনের খুসি উঠ্‌ছিলো উদ্দাম হ'য়ে, সে তা চাপা দিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছিলো না। তা'র ইচ্ছে কর্‌ছিলো, যা মুখে আসে তা-ই বল্‌তে—এমন কোনো কাজ কর্‌তে যা'তে কোনো দায়িত্ব নেই, ভাবনা নেই। একটা চঞ্চল লঘুতা, অবাধ মুক্তির দায়হীনতায় সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ছিলো। 'অন্তত,' শ্রীলতার নীরবতার ফাঁক সে তাড়াতাড়ি ভরিয়ে তুল্‌লো, 'মা-র সঙ্গে পরিচয়টা হোক্‌। তিনি খুসি হবেন আপনাকে দেখে।' ভিতরের দিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে ডাক্‌লে, 'মা।'

ইন্দিরা চশ্‌মা চোখে দিয়ে জান্‌লার ধারে বসে' ম্লান আলোয় বাঙ্‌লা তর্জ্জমায় শ্রীঅরবিন্দর একখানা বই পড়্‌ছিলেন, ছেলের ডাক শুনে হাতের বই রেখে দিয়ে উঠে এলেন। 'এই', ঘরে ঢুক্‌তে-ঢুক্‌তে তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'জান্‌লাগুলো সব বন্ধ করেছিস্‌ তো? না কি ছাঁট এসে—'কিন্তু শ্রীলতাকে লক্ষ্য করে'ই তিনি চুপ করে' গেলেন।

পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'মা, এঁর কথা তোমাকে বলেছি—শ্রীলতা দত্ত, আমাদের সঙ্গে পড়েন।'

শ্রীলতা চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌তে চাচ্ছিলো, ইন্দিরা হাত তুলে বাধা দিলেন।—'বোসো, বোসো। এই বৃষ্টিতে—'

'বৃষ্টির জন্যেই', পার্থপ্রতিম বাধা দিলে, 'উনি এখানে। যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে—বৃষ্টি—নিতে হ'লো আশ্রয়।'

'তোমাদের বাড়ি তো কাছেই?' ইন্দিরা জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীলতা বল্‌লে, 'এই তো তিন মিনিটের রাস্তা। প্রায়ই তো যাই আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে।'

'এর আগেও তো আস্‌তে পার্‌তে একদিন।'

'সে-কথা যে মনে না হয়েছে, তা নয়। কিন্তু—কিন্তু হ'য়ে ওঠে নি আর কি।' শ্রীলতার চোখ পার্থপ্রতিমের উপর একবার ঝল্‌সে গেলো। পার্থ-প্রতিম অনুভব কর্‌লে, তা'র মুখ একটু লাল হ'য়ে উঠ্‌ছে। তা'র মনে পড়্‌লো যে এতদিনের মধ্যে সে শ্রীলতাকে একবারও বলে নি—যতই প্রসঙ্গক্রমে, যতই বেসরকারিভাবে হোক্—একবারও বলে নি তা'র বাড়িতে আস্‌তে। কেন বলে নি? সে কি চায় নি যে শ্রীলতা আসুক্, না কি ভয় পেয়েছে পাছে সে না আসে? সে কি খেয়াল করে নি, অবহেলায় ভুলে'

গিয়েছিলো না কি ইচ্ছে করে', চেষ্টা করে' বলে নি? পার্থপ্রতিমের মন তা'র নিজের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। এই মুহূর্ত্তে, যা-ই হোক্, সে কিছু বল্‌তে চেষ্টা কর্‌লে—কোনো হাল্‌কা গোছের ধারালো কথা, যা শ্রীলতার গোপন শ্লেষকে কাটিয়ে দেবে—পার্‌লে না বল্‌তে। শ্রীলতা নিলে তা'র প্রতিশোধ।

'তোমাকে অনেকদিন থেকে দেখ্‌বার ইচ্ছে ছিলো,' ইন্দিরা বল্‌লেন, 'তুমি এলে—খুব খুসি হলুম।'

এট-ওটা আলাপ হ'লো খানিকক্ষণ। এমন-সব বিষয়, যা নিয়ে মেয়েরাই কথা কইতে পারে, এবং কইবেই—বয়েসের, রুচির কি জীবনের অবস্থার ব্যবধান যতই বড় হোক্। পার্থপ্রতিমের মনে হ'লো যেন সে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে।

কথায়-কথায় শ্রীলতা বল্‌লে, 'জানেন বোধ হয়, পার্থপ্রতিমকে খুব খাটিয়ে নিচ্ছি—নিজের স্বার্থের জন্য।'

'পার্থ তো বলে, তোমার সঙ্গে পড়ে' ও খুব আনন্দ পায়।'

'পেতে পারে বলে'ই পায়—আমি সে-জন্যে দায়ী নই। আনন্দ পাবার ক্ষমতাই ওর আশ্চর্য্য।'

'ভালো লাগাটাই তো আসল। তুমি এত লেখা-পড়া করেছো—ভালো না লাগ্‌লে কি কর্‌তে পার্‌তে।'

মৃদু, চাপা গলায় শ্রীলতা হেসে উঠ্‌লো। 'ভালো না লাগ্‌লেও অনেক-কিছু করা যায় বই কি—দায়ে পড়ে', না-করে' উপায় নেই বলে'—কি কোনো লাভের আশায়। বই আর পরীক্ষা—সত্যি, এ-সব জিনিস আমার ভালো লাগে না। আমি বরং নতুন একটা শাড়ি পর্‌তে পেলে খুসি হই, কি সিনেমায় যেতে পার্‌লে, কি কোনো বন্ধুর বাড়িতে যদি নিমন্ত্রণ থাকে, যেখানে অনেকে আস্‌বে।'

'মেয়েদের সম্বন্ধে,' ইন্দিরা বল্‌লেন, 'পুরুষরা যে-মত প্রচার করে' বেড়ায়, তুমি তো তা-ই বল্‌ছো।'

'কিন্তু সেটা সত্যি যে।'

'তা'র কোনো পরীক্ষা হয় নি। আমার মনে হয় এই যে মেয়েরাও যখন মানুষ, তখন মানুষ যা পারে, মেয়েদের তা না-পার্‌বার কারণ নেই।'

'কিন্তু মেয়েদের স্বভাবই যে খানিকটা আলাদা। বিশেষ কোনো-একটা জিনিসের মধ্যে মগ্ন হ'য়ে থাকতে তা'রা চায় না; তা'রা চায় অনেক জিনিসের মধ্যে ছড়িয়ে থাক্‌তে, বয়ে' যেতে চায় জলের মত। তাই তো সংসার করায় তাদের অত আনন্দ।'

'মেয়েদের স্বভাব জিনিসটা অনেকটা কুসংস্কারের মত। আমরা সবাই চোখ বুজে তা মেনে নিই।'

'আমি দেখেছি যে নিজেদের আড়ালে রেখে মেয়েরা কিছু কর্‌তে পারে না। তা'রা নিজেদেরকে প্রকাশ করে—তা'দের পোষাকে, কথা-বলায় ভাবভঙ্গীতে, তাদের ভালোবাসায়। সবই যখনকারটা তখন, একহাতে-নিয়ে-আরেক-হাতে-দাও গোছের ব্যাপার। ও-সব জায়গাতেই তা'রা উপস্থিত থাকে শরীর নিয়ে। কিন্তু যেখানে নিজকে প্রত্যক্ষভাবে, শরীর দিয়ে দেয়া যায় না, যে-জগত কল্পনার কি চিন্তার শূন্যে ভরা—সেখানে মেয়েরা নেই।'

'শরীরের উপর মেয়েদের একটু দুর্ব্বলতা তো থাক্‌তেই পারে—এত কষ্ট করে' তা'রা তৈরি করে' তা'কে। কিন্তু তা'র মানেই এ নয় যে মেয়েরা শরীরের বাইরে আর যেতেই পারে না।'

'চারদিকে তাকালে যা দেখা যায়, তা'তে তা-ই মনে হ'তে পারে, অন্তত। যে-জিনিস তাদের নিজেদের বাইরে, তা'র ভিতর দিয়ে নিজকে প্রকাশ কর্‌তে গিয়ে কোনো মেয়ে বেশিদূর যেতে পারে নি। তা'দের চরম দান হচ্ছে অভিনয়ে আর নাচে—যা'তে নিজেরই ভিতর দিয়ে নিজকে দিতে হয়।'

'তুমি যা বল্‌ছো, তা'র মধ্যে খানিকটা সত্যি তো আছেই। এ-কথা ঠিক যে মূর্ত্তি-পূজা মেয়েদের রক্তে

—তা'রা রূপক ভালোবাসে; ধরা-ছোঁয়া যায়, এমন-কোনো প্রতিমা চায়, নিছক শূন্য নিয়ে পড়ে' থাক্‌তে চায় না।'

'আর,' অনেকটা অবান্তরভাবে শ্রীলতা বল্‌লে, 'মেয়েরা লেখাপড়া কেন করে? যা'তে ভালো বিয়ে হ'তে পারে—সেইজন্যই তো?'

'সে-কথাই যদি বলো,' ইন্দিরা বল্‌লেন, 'কত ছেলেও তো লেখাপড়া করে, যা'তে একটা চাক্‌রি হ'তে পারে। সেটাই বা এমন-কী মহৎ উদ্দেশ্য! মেয়েরা বিয়ে হ'য়ে গেলে আর বই খোলে না—ক'টা ছেলেই বা কোনোরকমে একটা চাক্‌রি পেয়ে গেলে খবরের কাগজ ছাড়া কিছু পড়ে? সাধারণ হচ্ছে সাধারণ—তা'তে মেয়ে-পুরুষের ভেদ কর্‌তে যাওয়ার মানে হয় না।'

'মেয়েদের জীবনের প্রথম অংশ হচ্ছে বিয়ের জন্য তৈরি হওয়া, আর সে-বিয়ে হচ্ছে তাদের বাকি জীবন। আর এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাঝে-মাঝে যা'রা প্রতিবাদ করে, তা'রা মেয়ে নয়। মেয়েরা তা-ই চায়।'

'যতটা চায় বলে' লোকে মনে করে, ততটা না-ও হ'তে পারে। স্বামী, ছেলে, ঘর-সংসার—সেটা এক-রকমের সুখ, সার্থকতা—তা ঠিক। সেটা খানিকদূর

নিয়ে যায়, বেশিদূর নয়। সেটা সব নয়। একটু খোঁজ নিলেই এমন অনেক মেয়ের কথা আমরা জান্‌তে পার্‌বো, যা'রা এর বেশি চায়, কি চেয়েছে। তবে তা'রা বল্‌তে পারে না ; তা'দের ভাষা নেই।'

'চাইতে পারাই তো পাওয়ার আদ্ধেক।'

'ছাখো, লোকে বলে, মাতৃত্ব একটা গৌরব ; এবং এটাও সাধারণত ধরে' নেয়া হয় যে মেয়েরা প্রাণ দিয়ে তা-ই চায়। কিন্তু যদি প্রত্যেক মেয়ে তা'র মনের কথা বল্‌তো, তা হ'লে হয়-তো দেখা যেতো, সে-ইচ্ছেটা যত প্রবল বলে' চল্‌তি ধারণা, ততটা নয়। সে-গৌরবের বাড়াবাড়িতে অনেক মেয়ে মারা গেছে— এম্‌নিতে মর্‌ছে, না-মরে'ও মরেছে। অনেক মেয়ে মা হয়—না হ'য়ে উপায় নেই বলে ; ব্যাপারটা ভালো কি মন্দ, দুঃখের কি আনন্দের, তা বোঝ্‌বার সময় হয় না। এমন সময় আমাদের দেশে প্রায় সব মেয়ের জীবনেই আসে, যখন সে মাতৃত্বকে দারুণ ভয়ের চোখে দেখ্‌তে আরম্ভ করে ; কিন্তু—তা'কে যে বিশ্বাস করানো হয়েছে যে সেটাই তা'র গৌরব। বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না।'

'তবু তো তা'রা মেনে নেয় যে এ-ই তাদের জীবন।'

'তা ছাড়া আর কী তা'রা কর্‌তে পারে ? হঠাৎ

একদিন চম্‌কে উঠে যদি খেয়াল হয়, তা হ'লেই বেশি। আমি একজনকে জান্‌তুম, পনেরো বছরে তা'র বিয়ে হয়—তা'র সময়ের পক্ষে খুবই দেরিতে, বল্‌তে হবে। ষোলো থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে সে তেরোটি সন্তান প্রসব করে—তা'র মধ্যে চারটি মারা গিয়ে ন'টি আছে। তা'র শেষ ছেলেটি যখন হ'লো, সে পড়্‌লো কঠিন অসুখে; এমন আশা ছিলো না যে বাঁচ্‌বে। বছরখানেক দারুণ কষ্ট পেয়ে সে ভালো হ'য়ে উঠ্‌লো। এমন একটা অস্ত্র করা দরকার হ'লো তা'র শরীরে, যা'তে আর তা'র সন্তান হবার কোনো সম্ভাবনা রইলো না। আস্তে-আস্তে তা'র শরীর যেন নতুন প্রাণে ভরে' উঠ্‌তে লাগ্‌লো। আরো কয়েক বছর গেলো। কোলের ছেলেটি বড় হ'য়ে উঠ্‌লো—তা'কে নিয়ে এখন ব্যস্ত না থাক্‌লেও চলে। তখন—চল্লিশ পার হ'য়ে এসে জীবনে প্রথম বার সে হাঁফ ছাড়্‌তে পার্‌লো, নিজের চারদিকে তাকাতে পার্‌লো। সে-সময়ে তা'কে যা'রা দেখেছে, সবাই লক্ষ্য করেছে তা'র মধ্যে পরিবর্ত্তন: হঠাৎ যেন তা'র যৌবন ফিরে এলো। "তিরিশ বছর হ'তে চল্‌লো আমার বিয়ে হয়েছে," একদিন সে আমাকে বল্‌ছিলো, "বুঝ্‌তেই পার্‌লুম না, কী করে' কেটে গেলো এতগুলো বছর। একটি

ছেলে কোল ছাড়্‌তে-না-ছাড়্‌তেই আর-একটি হয়েছে: এক মুহূর্ত্ত ফাঁক ছিলো না। এতগুলো বছর যেন একটা একটানা আবছায়া। এতদিনে আমার সময় হয়েছে—বাঁচ্‌তে আরম্ভ করেছি।" এসেছিলো আমার কাছে একখানা বই নিতে। বল্‌লে, "ছেলেবেলায় বই পড়্‌তে খুব ভালোবাস্‌তুম; তারপর বছরের পর বছর কেটে গেছে, একটা ছাপানো পৃষ্ঠা কখনো চোখ দিয়েও দেখ্‌তে পারি নি। এখন—আর-কোনো ইচ্ছে আমার নেই: শুধু—কেউ যদি আমাকে রাশি-রাশি বই এনে দেয়, আর আমি বসে'-বসে সেগুলো পড়ি।" একদিন আমি তা'কে বলেছিলুম, "এ-বই কী পড়্‌বে—এটা নেহাৎ বাজে।" সে বলেছিলো, "বাজে! ছাপা যে হ'তে পেরেছে, এ-ই আমার পক্ষে ঢের। যা-কিছু পড়ি, তা-ই আমার ভালো লাগে।" অথচ—তা'র চেয়ে বেশি ছেলেমেয়ের যত্ন কোনো মা কখনো করে নি, তা'র মত পাকা গিন্নি খুব কমই চোখে পড়ে।'

শ্রীলতা কোনো কথা বল্‌লে না। তা'র নীরবতা প্রতীক্ষমান। কিন্তু ইন্দিরা আর-কিছু বল্‌লেন না। জান্‌লায় বৃষ্টির নরম শব্দ; বৃষ্টি ঝরে' পড়্‌ছে যেন সমস্ত আকাশকে লুঠ করে' নিয়ে। ইন্দিরা যতক্ষণ কথা বল্‌ছিলেন, সেই শব্দটা যেন চাপা ছিলো:

এইবার হঠাৎ ফুটে উঠ্‌লো একটা অদ্ভুত, অস্পষ্ট, বিশ্বব্যাপী উপস্থিতির মত। খানিকক্ষণ—তা ছাড়া যেন কোনোখানে কিছু নেই।

তারপর ইন্দিরা উঠে দাঁড়ালেন। বল্‌লেন, 'একটু বোসো তোমরা; আমি চা তৈরি করে' আন্‌ছি। শ্রীলতা প্রতিবাদ কর্‌তে ভুলে' গেলো। ইন্দিরার কথা বোধ হয় ভালো করে' তা'র কানেও ঢুক্‌লো না।

ইন্দিরা আর শ্রীলতা যতক্ষণ কথা কইছিলো, পার্থপ্রতিম একটু দূরে বসে' চুপ করে' শুন্‌ছিলো; একটি কথা বলে নি। ইন্দিরা ঘর থেকে চলে' যাবার একটু পরে সে বল্‌লে, 'কেন আপনি মা-র কাছে এমন-সব কথা বল্‌তে গেলেন, যা আপনি মোটেও বিশ্বাস করেন না?'

'কী করে' জানেন, করি নে?' শ্রীলতা মুচকি হাস্‌লো।

'জানি বলে'ই বল্‌ছি।'

'থাক্‌, আমার কথা থাক্‌,' একটু চুপ করে' থেকে শ্রীলতা বল্‌লে, 'আপনার কথা বলুন। আমি যখন এলুম, আপনি কী কর্‌ছিলেন?'

'মনে-মনে কবিতা তৈরি কর্‌ছিলুম একটা। না— একটার বেশি; ভাব্‌ছিলুম, কোন্‌টা লেখা যায়।'

'কবিতার হত্যা! কী করে' আমি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে পারি?'

'সে-জন্য ভাব্‌বেন না। ইচ্ছে কর্‌লে আমি এখনো লিখে ফেল্‌তে পারি—আপনি যদি তা-ই চান্‌।'

'না, থাক্‌—এখন বরং গল্প করুন; পরে ঢের সময় পাবেন লেখ্‌বার।—আচ্ছা, কী করে' আপনি কাটান সন্ধ্যাবেলাটা?'

'কী করে'? কী যেন, হিসেব দেয়া মুস্কিল। এক রকম করে' কেটে যায়ই সময়টা।'

'তা'র মানে, আপনি টের পান্‌ না, সময় যে কাট্‌ছে। ভাগ্যবান!'

'জীবনে এত জিনিস আছে ভালো লাগ্‌বার—'

'কী সেগুলো?'

'কী? সবই। এই বৃষ্টি—বিকেলের রোদ, বই, বাস্‌-এ বেড়ানো, কথা-বলা, চুপ-করে'-থাকা—কী নয়?'

'আমি তো খুঁজে-খুঁজে মরি কোথায় গেলে, কী কর্‌লে ভালো লাগ্‌বে।'

'সেটা খুঁজতে হ'লেই তো বিপদ। দিনগুলো যেমন কাটে সাধারণভাবে—তা'রই ভিতরে ছোটখাটো সব জিনিসে যদি মজা না পাই, তা হ'লে আর বেঁচে সুখ

থাকে না। সব চেয়ে আমি ঘৃণা করি এ-কথা শুন্‌তে—"ভালো লাগে না।"'

'রোজ সকালে উঠে আমার ভাবনা হয়, আজকের সন্ধেটা কী করে' কাট্‌বে।—' শ্রীলতা আরো কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলো, হঠাৎ থেমে গেলো।

'তারপর ?'

'রোজই আছে কিছু-না-কিছু। খুব হৈ-চৈ, ফুর্ত্তি। তারপর রাত্তিরে শোবার সময় হঠাৎ মনে হয়, যেমন হওয়া উচিত ছিলো, যেমন হবে বলে' ভেবেছিলাম, ঠিক তেমনটি হ'লো না—কোথায় যেন রয়ে' গেলো ফাঁক। সন্দেহ হয়, অন্য রকম হ'লে কি ভালো হ'তো এর চাইতে ? পাছে কিছু হারাই, এই উদ্বেগ, প্রতি মুহূর্ত্তে এই জেদ করে' ভালো-লাগানো—এর মধ্যে একটা হতাশা আছে।'

'যে-সব লোকের কল্পনাশক্তি নেই, তা'দেরই কপালে এ-দুঃখ। খুসি হ'বার জন্যেও তা'রা চল্‌বে বাঁধা-ধরা পাকা সড়কে। ভালো আমার লাগ্‌বেই বলে' উঠে-পড়ে' লাগ্‌লে কি কিছু ভালো লাগ্‌তে পারে। প্ল্যান করে' কি আর ফুর্ত্তি হয়।'

'যা হয়, তা ক্লান্তি। এক ক্লান্তিকে কাটাতে আমরা তা'র চেয়েও বড় ক্লান্তিকে ডেকে আনি।'

'আমরা যদি সবাই নিজের ইচ্ছেমত চল্‌তে পার্‌তুম, তা হ'লেই আর-কোনো মুস্কিল থাক্‌তো না। মানুষ বাঁচে কিসে? তা'র ইচ্ছায়।'

'আমার তো ধারণা আমি আমার নিজের ইচ্ছেমতই চলি।'

'ইচ্ছা অনেক রকম আছে—ফ্যাশানের ইচ্ছা, ঔচিত্যবোধের ইচ্ছা, যূথবদ্ধ মানবের—যা'র নাম হচ্ছে গিয়ে সমাজ, তা'র ইচ্ছা। এবং এগুলোকে আমরা ভুল কর্‌তে পারি নিজের ইচ্ছে বলে'। যে যে-সময়ে, যে-সমাজের মধ্যে জন্মায়, তা'র কতগুলো সংস্কার, কতগুলো আইন থাকে—সে তা-ই মেনে চলে, আর মনে করে, কী যে ভয়ানক কাণ্ড করে' ফেল্‌ছে, কারণ সে-সব আইন আগেকার কোনো সময়ের, লুপ্তপ্রায় কোনো সমাজের উল্টো। আজকের দিনে যে-মেয়ে ঠোঁটে রঙ্‌ মেখে সিগ্রেট খায়, সে তা করে, তা করা উচিত মনে করে বলে'ই, তা'র সমাজের তা-ই বিধান বলে'ই। সে যদি তা ভালো লাগে বলে'ই কর্‌তো, তা হ'লে সে তা নিয়ে বড়াই কর্‌তো না। তা'র ধারণা, সে সমাজকে ভাঙ্‌ছে। হ্যাঁ, ভাঙ্‌ছে; কিন্তু সেই সমাজকে, সে যা'র কোনো তোয়াক্কা রাখে না, যা তাকে আমলের মধ্যেই আনে না। সে তা-ই কর্‌ছে, তা'র নিজের সমাজে যা

শোভন ও সঙ্গত বলে' বিবেচিত। আসলে, সে অত্যন্ত কন্‌ভেন্‌শ্যনাল। যে-হিন্দু স্ত্রী বছরের পর বছর কখনো চেঁচিয়ে হাসে না, তা'র সঙ্গে এ-মেয়ের কোনো মূলগত প্রভেদ নেই। দু'জনেই তা-ই করে, তা'র পার্শ্ববর্ত্তীরা, একগোষ্ঠীভূতরা যা আশা করে তা'র কাছ থেকে। বেপরোয়া, উড়নচণ্ডী বলে' আজকাল যা'রা খুব বাহবা পাচ্ছে, খুঁড়ে দেখ্‌তে গেলে তা'দের মধ্যেও সেই মামুলি সামাজিক জীব।'

'সমাজের ইচ্ছাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়াই কি যায়?'

'আমার তো মনে হয়, সমাজের বিরোধী হওয়া—অন্তত, সমাজ-সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের প্রতি কর্ত্তব্য। সুখী হ'বার সেটাই একমাত্র উপায়। গণ-ইচ্ছার তাড়নায় যেন কখনো কিছু না করি। কর্ত্তব্যবোধের খাতিরে যেন নিজের প্রেরণাকে ঘোলাটে করে' না ফেলি। সমাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? অন্য লোকের জন্য আমার কী মাথা-ব্যথা? আমার যা ইচ্ছে, আমি তা-ই কর্‌বো; শুধু এটা স্পষ্ট করে' বুঝ্‌তে হবে যে ইচ্ছেটা আমারই নিজের।'

'এ-সব কথা আমার মত লোকের জন্য নয়।'

'কেন নয়? নিজের জীবনের উপর প্রত্যেকেরই অধিকার।'

'আইন তৈরি করে অসাধারণ লোকরা সাধারণ লোকের জন্য—আরো বেশি অসাধারণ লোকের ভাঙ্‌বার জন্য। আমার পক্ষে,' শ্রীলতার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠ্‌লো, 'আইন মেনে চলাই সহজ। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চল্‌বো, সব দিক বজায় রেখে চল্‌বো—নিজকে প্রতি পদে খাপ খাইয়ে নেবো—তা'র জন্যে আমি। বিদ্রোহের রাস্তা আমার নয়—সে-দুঃখ আমার সইবে না।'

'কিন্তু ঠিক যে নিশান উড়িয়ে বিদ্রোহ—তা-ও তো নয়। অতখানি স্বীকারই বা আপনি কেন কর্‌তে যাবেন? শুধু দূরে সরে' আসা, শুধু স্বীকার না করা, ভাবনা থেকে ছাড়া পাওয়া। আমার পক্ষে যা নেই, তা আমার কোনো ক্ষতি কর্‌তে পারে না।'

'আপনার কথা বড় স্বার্থপর শোনাচ্ছে।'

'স্বার্থপর—নিশ্চয়ই। স্বার্থপর কে নয়? যে বলে সে স্বার্থপর নয়, সে হয় মিথ্যেবাদী, না হয় জন্ম-ইডিয়ট। আমার নিজের মত আর কে আছে—আমার পক্ষে?'

'আপনার কথা বুঝ্‌তে পারি—দরকার হ'লে,

লোককে চমক লাগাতে হ'লে বল্‌তেও পারি ও-রকম কথা। আমরা সব সময় শুধু কথা কইবো—আর কথা কইবো; আর এদিকে, দিন থেকে দিন, সেই মেনে চল্‌বো আর মানিয়ে চল্‌বো।'

'সে আপনি যেমন মনে করেন।'

এর পরে আর-কোনো কথা হ'লো না। হঠাৎ দু'জনেই চুপ—দু'জনের মনেই এই কুণ্ঠা, যেন বড় বেশি বলে' ফেলেছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার যেন কা'র ঘন চুলের মত নিঃশ্বাসের উপর ভারি হ'য়ে পড়্‌ছে। শ্রীলতা বসে' আছে জান্‌লার কাছে, তবু তা'র মুখ দেখা যায় কি না যায়। রেখাগুলো অস্পষ্ট। আর তা'র শাড়ির ভাঁজ ফিকে স্মৃতির মত। বাইরে আকাশ ভেঙে যাচ্ছে বৃষ্টিতে আর বৃষ্টিতে। একটানা, একঘেয়ে, বিরামহীন শব্দ—শুন্‌তে-শুন্‌তে মনে হয় যেন বিশাল, চিরন্তন শূন্যতা হঠাৎ কথা কয়ে' উঠেছে। যেন সৃষ্টির আগেকার বিশ্বে এসে পড়েছি—যেখানে কিছু নেই, শুধু নিরবচ্ছিন্ন মহাব্যোম আকাশে-আকাশে প্রসারিত। সেই দিবারাত্রিহীন নিঃসময়ের ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা —তা-ই যেন রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে এই বর্ষণস্বরে। অনেকক্ষণ ধরে' শুন্‌লে চেতনার দেয়াল দূরে সর্‌তে-সর্‌তে অসীমে মিলিয়ে যায়, পৃথিবী যায় লুপ্ত হ'য়ে,

নিজকে হারিয়ে ফেল্‌তে হয়। গাঢ় ঘুমের মত নামে আত্মার উপর—অস্তিত্বের অবসান। মোহাচ্ছন্ন, ওরা দু'জনে শুন্‌লে বৃষ্টির শব্দ, খানিক পরে তা-ও আর শুন্‌লে না। মুহূর্ত্তগুলো বয়ে' চল্‌লো।

তারপর ইন্দিরা এলেন চা নিয়ে; জিনিসগুলো একটা টেবিলের উপর রেখে বল্‌লেন, 'কী-রকম খাও জানি নে, নিজেই ঢেলে নাও।' হাত বাড়িয়ে তিনি সুইচ্‌টা টিপ্‌লেন। আলোয় ভেসে গেলো ঘর, ফিরে এলো সমস্ত পৃথিবী, শূন্য ভরে' উঠ্‌লো লক্ষ-লক্ষ শতাব্দীর ধারাবাহিকতায়। আর বৃষ্টির শব্দ—তা শুধুই বৃষ্টির শব্দ, বঙ্গোপসাগরের উত্তাপ-সঞ্চয়ের আত্ম-মোচনের শব্দ—তা ছাড়া কিছু নয়।

পেয়ালায় চা ঢাল্‌তে-ঢাল্‌তে শ্রীলতা বল্‌লে, 'বৃষ্টিটা কি আজ আর থাম্‌বে না?'

পার্থপ্রতিম উঠে গিয়ে একটা জান্‌লা খুল্‌লো। তা'র মুখের উপর লাগ্‌লো মৃদু ছাঁট। ভারি ঠাণ্ডা—বেশ লাগ্‌লো তা'র। এত বৃষ্টি—তবু গরম। সে একটুখানি তাকিয়ে থাক্‌লো বাইরের দিকে, তার-পর আবার শার্সিটা লাগিয়ে দিলে। বল্‌লে, 'একটু কমেছে।'

চা-খাওয়া শেষ হ'তে-হ'তে বৃষ্টি আরো কমে' এলো।

রাস্তায় লোকজন শোনা যাচ্ছে। ছপ্‌ছপ্‌ শব্দে এক-দল চলে' গেলো।

পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে।'

'রাস্তার আর দোষ কী? কল্‌কাতার কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ।'

'কী করে' যাবেন?'

'যেতে পার্‌বোই একরকম করে'। দেখি, কী অবস্থা।'

পার্থপ্রতিম উঠে গিয়ে দরজাটা খুল্‌লো। শ্রীলতা এলো সঙ্গে। বাইরে তাকিয়েই বলে' উঠ্‌লো, 'বাঃ!'

রাস্তায় এক হাঁটু জল। ফুটপাথ গেছে ভেসে। ঘোলা জলে গ্যাসের আলো চিকমিক কর্‌ছে। একটা গাড়ি চলে' গেলো কূল থেকে কূলে ছল্‌ছলিয়ে। ঢেউ ছড়িয়ে পড়্‌লো দু'ধারের বাড়িগুলোর গোড়া পর্য্যন্ত।

শ্রীলতা একটু তাকিয়ে থেকে বল্‌লে, 'ভারি মজা তো।'

পার্থপ্রতিম আকাশের দিকে তাকালো।—'এখনো মেঘ আছে, আবার আস্‌বে হয়-তো খানিক পরেই। এই ফাঁকে পালান্‌।'

শ্রীলতা একটা হাত বাড়ালে ফোঁটা ধর্‌তে।—'এখনো পড়্‌ছে একটু-একটু।'

'এখানেই দাঁড়ান্—কোনোগতিকে একটা রিক্শা এসে পড়্লেই ধর্তে হবে। তা ছাড়া উপায় নেই।'

দরজায় দাঁড়িয়ে দু'জনে অপেক্ষা কর্তে লাগ্লো। এক সময়ে তাদের দু'জনের চোখোচোখি হ'লো। কেউই চোখ সরিয়ে নিলে না। শ্রীলতার ঠোঁট আদ্ধেক খুল্লো—যেন কিছু বল্তে যাচ্ছে, কিন্তু কথা না বলে' সে হঠাৎ মৃদু দীর্ঘ এক হাসি হেসে উঠলো।

আর শ্রীলতার চোখের দিকে তাকিয়ে, কেন, তা না জেনে, দুর্নিবার, আকস্মিক, পার্থপ্রতিমও হেসে উঠ্লো মুক্তস্বরে।

সেই রাত্তিরে পার্থপ্রতিম যখন খেতে বসেছে, ইন্দিরা বল্লেন, 'বেশ মেয়েটি; লেখাপড়া শিখেছে, কিন্তু শুকিয়ে যায় নি। ভিতরে প্রাণ আছে।'

পার্থপ্রতিম বল্লে, 'হুঁ।'

পরিচ্ছেদ

এখানে যদি কোনো বুদ্ধিমান পাঠক বলেন, 'বুঝেছি', তাঁকে শুধু এ-ই বল্তে পারি যে তা হ'লে তিনি আর যেন না পড়েন: কারণ, আমার এই গল্প সে-

শ্রেণীর নয়, কী-হয় কী-হয় গোছের রুদ্ধশ্বাসে পাঠককে যা চুলে ধরে' পাতার পর পাতা টেনে নিয়ে যায়, ঘটনার পর ঘটনার ফাঁসে পাঠকের মন আটক করে' মোচড়ের পর মোচড়ে উদ্‌ভ্রান্ত করে' তোলে, যা'তে অবকাশ নেই মুহূর্ত্তের। ও-রকম গল্প যদি পড়্‌তে চান্, আপনার জন্যে আছে অনেক লেখক, উত্তেজনায় ডোবানো তাদের কলম, উদ্ভাবনায় শ্রান্তিহীন তাদের মন। অনেক তাদের কৌশল, অপূর্ব্ব তাদের চাতুরী। এক মুহূর্ত্ত আগে আপনাকে জানতে দেবে না, কী আস্‌ছে এখন; কৌতূহলকে ধারালো করে' রাখ্‌বে সব সময়; অবাক হ'তে-হ'তে, ধাক্কা খেতে-খেতে, যা আপনার কাছে মনে হবে অসম্ভব জট-পাকানো, তা কী করে' আস্তে-আস্তে ছাড়িয়ে আনা হচ্ছে, তা দেখ্‌তে-দেখ্‌তে—বই মুড়ে রেখে আপনি বলে' উঠ্‌বেন, 'সাবাস!' কোথাও এতটুকু ঢিলে সূতো বেরিয়ে নেই; সব একেবারে খাপে-খাপে, মুখে-মুখে মিলে গেছে। সাবাস! আর তা'র পরেই ছুট্‌বেন চমক-লাগানো-তরো গল্পের সন্ধানে, জমাট থেকে জমজমাটে, ঠাস্‌বুনানির নিরেট থেকে নিরেটতমোতে।

তারার মাঝে-মাঝে থাকে আকাশের ফাঁক, যা'র ভিতর দিয়ে রাত্রি নিজকে ছড়িয়ে দেয়। গানকে

ঘের দিয়ে থাকে নীরবতার বেড়া—তাই না তা উচ্ছল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে রেশ থেকে রেশে, প্রতিধ্বনির পরিপূর্ণতায়। কবিতার আগে আর পিছে আলস্যের অবাধ লীলা—সেখানেই কল্পনার আলো খেলে' যায় মুহূর্তে-মুহূর্তে রঙে-রঙে। একটা কবিতা পড়ি, পড়ে' খানিকক্ষণ চুপ করে' থাকি: সেই নিষ্ক্রিয় নীরবতাই তা'র উপভোগ। যতক্ষণ তা'কে পড়ি, ততক্ষণ মন শুধু গ্রহণ কর্‌তে ব্যস্ত; আর, যখন কবিতা শেষ হ'য়ে যায়, অথচ মনের মধ্যে তা'র অনুরণন থেমে যায় না, নিজের মনের রসে ভিজিয়ে তা'কে নতুন করে' সৃষ্টি করি, সেই তো আনন্দ। কবিতা যদি একটার পর একটা ঊর্দ্ধশ্বাসে গিল্‌তে হ'তো, তা হ'লে অত বেশি ঠাসাঠাসিতে সবগুলোই মারা পড়্‌তো। যেখানে অবকাশ নেই, সেখানে আনন্দ নেই।

আমি এ-গল্প লিখতে বসেছি পার্থপ্রতিমকে চিনি বলে'—ভেবে দেখি নি, ব্যাপারটাকে ঠিক গল্পের ছাঁচে ফেলা যায় কিনা। পার্থপ্রতিমকে আমি পছন্দ করি: শ্রীলতাকে দেখেছি দূর থেকে। এদের দু'জনের মধ্যে কী যে রহস্য ঘনিয়ে উঠ্‌ছে, তা'র খানিকটা পেয়েছি আভাসে আর ইঙ্গিতে, বাকিটা বুঝেছি আন্দাজে। যেটুকু জানি আর অনেক বেশি যা জানি নে, তা'র

মাঝখানটা ভরে' দিয়েছি কল্পনায়। ওদেরকে অনুভব করেছি কল্পনা দিয়ে, প্রবেশ করেছি যেন ওদের মনের মধ্যে; মনে হচ্ছে, সবই যেন আমি জানি, যেন আমার চোখের সাম্‌নে পল্লবের পর পল্লবে ফুটে উঠ্‌ছে ওদের মন। আর এই হয়-তো সব চেয়ে বড় রহস্য, সব চেয়ে আশ্চর্য্য—যেন দ্রৌপদীর অফুরন্ত শাড়ি; স্তরের পর স্তর অবিশ্রান্ত খুলে-খুলে দেখালেও মনের শেষ নেই।

এখন, মাঝপথে এসে একবার আশে-পাশে তাকিয়ে দেখ্‌ছি; মনে হচ্ছে, গল্প লেখ্‌বার জন্য পার্থপ্রতিমকে না নিলেই যেন ভালো কর্‌তুম। কারণ, ও সে-রকমের লোক নয়, যা'র সম্বন্ধে এটা সহজে ভাবা যায় যে সে কোনো মেয়ের জন্য সর্ব্বস্ব পণ কর্‌বে। এমন কি, আমার এ-ও সন্দেহ হয়, এতদিনের মধ্যে শ্রীলতার সঙ্গে প্রেমে পড়্‌বার কথা ওর কখনো মনে হয়েছে কিনা। সে-সম্ভাবনার প্রতি যেন ওর খেয়ালই নেই। কোনো মেয়ের প্রণয়ী-হিসেবে সে একটি অপদার্থ গোছের। প্রথম কথা, সে বড় ঢিলে; অকারণে অসম্ভব সময় নিয়ে ফেল্‌বে। তারপর সে উচ্চ আর্দ্রস্বরে কখনো তা'র প্রেমের শপথ-বাণী উচ্চারণ কর্‌বে না; বিয়ে কর্‌বার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে যাবে না;

চাইবে না প্রণয়িণীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে—কোনো-ভাবেই প্রকাশ পাবে না, কোনোরকম আলোড়ন চলছে তা'র মনে। আলোড়ন চলছে কিনা, সেটাই যে সন্দেহের। হ'তে পারে, তা'র মনে সে-উত্তাপ, সে-তীব্রতাই নেই—কিম্বা হয়-তো সেটা ব্যয়িত হ'য়ে যায়, অন্য ভাবে, অন্য স্রোতে। কথায়, কবিতায়। আমি জানি, এ-সময়ে পার্থপ্রতিম খুব বেশি কবিতা লিখ্‌তো; এবং সে-সব লেখ্‌বার সময়—সে নিজেই তা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌তো—শ্রীলতাই থাক্‌তো তা'র মনে, শ্রীলতার সংস্পর্শে আস্‌বার জন্যেই যেন নতুন সুরে কথা কয়ে' উঠ্‌ছে তা'র মন। কিন্তু কোনো মেয়েকে উদ্দেশ্য করে' কবিতা লেখা এক কথা; আর তা'কে ভালোবাসা আর। কবিতা লেখ্‌বার জন্য শুধু একটু উস্কে দেয়া দরকার—বাকিটা, যে লেখে তা'রই মনের কাণ্ড। কবিতা লেখ্‌বার জন্য সব সময় ভালো-বাস্‌বার দরকার করে না; এমন কি, সত্যিকারের কোনো সংস্পর্শে না এসেও তা লেখা যায়। যত মেয়েকে উপলক্ষ্য করে' একজন কবিতা লেখে, সবাইকে যদি ভালোবাস্‌তে হ'তো, তা হ'লে আর উপায় ছিলো না। কবিতা হচ্ছে মুহূর্ত্তের একটা জ্বলে'-ওঠা, সেই মুহূর্ত্তেই তা'র শেষ; মনের ক্ষণিক

কোনো ভাবের বিলাস : সে সব কথাই যদি তা'র অঙ্গীকার বলে' ধরা হয়, এমন কবি নেই যে আপত্তি না করবে। হঠাৎ আলো লাগে মনে ; অস্থায়িতার বৃন্তে টলোমলো করে' ওঠে ফুল ; কে-ই বা তা'র হিসেব রাখে, আর কে-ই বা ফিরে তাকায়। তা নিয়ে একজনকে চেপে ধরা যায় না : সে নিজেই নিজের কাছে দায়ী নয়। আর পার্থপ্রতিম তা ভালো করে'ই জান্‌তো ; সে তা'র মনে কোনো মোহ সঞ্চারিত হ'তে দেয় নি ; মুহূর্ত্তের জন্যও এমন অনুমান করে নি যে যে-হেতু শ্রীলতা হ'য়ে উঠ্‌ছে তা'র কবিতার মেয়ে, সেইজন্যই সে যা'কে বলে তা'কে ভালোবাসে। আর সত্যি বল্‌তে, ভালোবাসা ব্যাপারটা থেকে তা'র মন স্বতঃই যেন একটু পিছিয়ে যেতো ; অত বেশি অন্তরঙ্গতা তা'র ভাব্‌তে ভালো লাগ্‌তো না। তা'র মনের মধ্যে একটা ভীরুতা ছিলো—নিরাপদ থাক্‌বার, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ? না কি বুদ্ধির অতিরিক্ত চর্চ্চায়, কল্পনার জিনিস নিয়ে বড় বেশি তন্ময়তায় সে হারিয়ে ফেলেছিলো শরীরের জগতের সঙ্গে সংস্পর্শ, যেখানে বাজ্‌ছে রক্তের অণুতে-অণুতে বাসনার সুর ? অবিশ্যি একই কথা হ'লো ; পার্থপ্রতিমের সম্পর্কে, অন্তত, একটা থেকে আর-একটা বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু

আমারও মনে হয়েছে, পার্থপ্রতিম পরস্পরের সঙ্গে মিশে-যাওয়া গোছের সম্পর্ক অপছন্দ করতো, সে যেন নিজকে দিতেই পারতো না সে-রকম করে', বেরিয়েই আসতে পারতো না নিজের ভিতর থেকে। সে অপছন্দ করতো সেই জিনিসই, যা সে পারতো না। আমার অন্তত তা-ই মনে হয়েছে।

আর এদিকে, শ্রীলতার কথা তো আগেই বলেছি, সে যে ঝোঁকের মাথায় কিছু করে' ফেলবে, তা সম্ভব নয়। তা'র চালচলন নেহাৎই সোজাসুজি; সে এত বেশি স্পষ্ট যে সে নিজের সম্বন্ধে যেটুকু বুঝতে দেয়, তা'র বেশি কল্পনা করা শক্ত। সে যদি পার্থপ্রতিমকে ভালোইবাসতো, তা হ'লে নিজের কাছে সেটা লুকোতো না: এবং নিজের কাছে না লুকোলেই অন্যের কাছেও সেটা যথাসময়ে প্রকাশ পেয়ে যেতো। এখন এই দু'জনের মধ্যে মুস্কিলই এই যে ওরা এত বেশি সহজ আর স্পষ্ট: যেখানে ভাণ নেই, সেখানে ভালোবাসা সহজে আসে না। যে-কোনো ভালোবাসার ব্যাপারেই প্রথম দিকটায় খানিকটা আত্ম-সচেতন অভিনয়ের দরকার। আমরা যদি যা মনে আসে তা-ই বলি; যদি অন্যের মনকে স্পষ্ট বুঝেও তা জানবার জন্য বাহ্যিক আগ্রহ প্রকাশ না করি, যদি সব সময়

চেষ্টা না করি নিজকে আড়ালে রাখ্‌বার—মোট কথা, দু'জনের মধ্যে যদি এটা প্রণয়ের যুদ্ধ না হয়, তা হ'লে···মোট কথা, তা হ'লে প্রেম হয় না।

নিতান্ত খোলাখুলি ভাব বন্ধুদের মধ্যে ভালো, প্রণয়ীদের মধ্যে অসঙ্গত। কেননা, যা'কে ভালোবাসি, তা'কে দেখি সমগ্র মানবতা থেকে আলাদা করে'; তা'র মধ্যে যেটুকু প্রচ্ছন্ন, তা'তেই তা'র প্রকাশ; যেখানে তা'র রহস্য, প্রেমের রাজধানী সেখানেই। তা'কে খানিকটা কল্পনা করে' না নিলে চলে না। কিন্তু ওরা দু'জন কল্পনার কোনো জায়গা রাখে নি, শ্রীলতা আর পার্থপ্রতিম, ওরা দেখেছিলো পরস্পরকে বুদ্ধির আলোয় স্পষ্ট করে'। দু'জনে দু'জনার পর্য্যবেক্ষণে সীমাবদ্ধ।

একটা দৃষ্টান্ত। এক বিকেলে (সেই বৃষ্টির সন্ধের পরে শ্রীলতা মাঝে-মাঝে আস্‌তো পার্থপ্রতিমের বাড়িতে) শ্রীলতা দরজায় ধাক্কা না দিয়েই হঠাৎ ঢুকে পড়্‌লো পার্থপ্রতিমের ঘরে, সে তখন টেবিলের উপর নিচু হ'য়ে কী লিখ্‌ছিলো। 'নাঃ,' শ্রীলতা বলে' উঠ্‌লো, 'আপনার বাড়িতে আর আসা যাবে না, দেখ্‌ছি। সব সময় এত কী লেখেন! এসে কী যেন দোষ করে' ফেলেছি, মনে হয়।'

'দোষ আমারই।' পার্থপ্রতিম চোখ তুলে হাস্‌লো, 'কিন্তু কতদিন যে আমি চুপচাপ বসে' ছিলুম কি পায়চারি কর্‌ছিলুম ঘরের মেঝেয় কি—কি কিছুই কর্‌ছিলুম না, সেগুলো আর আপনার মনে নেই।'

'পরে কর্‌বো তর্ক। এখন চুপ কর্‌ছি। শেষ করুন লেখা।'

'হ'য়ে গেছে শেষ। আপনি একেবারে ঠিক সময়ে এসেছেন।' পার্থপ্রতিম তা'র কাগজপত্র টেবি-লের একপাশে সরিয়ে রেখে তা'র উপর একটা বই চাপা দিয়ে রাখ্‌লো।

শ্রীলতা এসে দাঁড়ালো তা'র চেয়ারের পাশে। জিজ্ঞেস করলে, 'দেখ্‌তে পারি, কী লিখেছেন?'

'সানন্দে।' পার্থপ্রতিম রাইটিং প্যাডের উপরের পাতাটা ছিঁড়ে শ্রীলতার হাতে দিলে।

শাদা কাগজের উপর দিয়ে সরু-সরু সাপের মত কয়েকটা লাইন চলে' গেছে; মাঝে-মাঝে যেখানে তু' একটা কথা কালি ভর্ত্তি করে' দিয়ে সযত্নে কাটা হয়েছে, শাদা দেয়ালের গায়ে ছড়ানো, উপমাটা শ্রীলতার তখন-তখন মনে হ'লো, মরা মাছির মত। তা'র নিজের কাছে বেশ ভালো লাগ্‌লো উপমাটা। ভাব্‌লে, পার্থপ্রতিমকে সেটা বলে, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে

মন বদ্‌লে বল্‌লে, 'আপনার কাটাকুটিগুলো তো চমৎকার হয়।'

'সমস্ত জিনিসটার মধ্যে কি আপনি ঐ পেলেন প্রশংসা কর্‌বার ?'

'না পড়ে' যতটা প্রশংসা করা যায়···কিন্তু পড়্‌ছি।'

ছোট একটা কবিতার টুক্‌রো, দু' মিনিট লাগ্‌লো না পড়্‌তে। শ্রীলতা কাগজটা পার্থপ্রতিমকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'বেশ ভালোই তো হয়েছে।'

'খুসি হ'লাম শুনে।'

'এটা কি ছাপ্‌তে দেবেন কোথাও ?'

'দেখি।'

'মুখে বল্‌তে যা লজ্জায় বাধে, তা বল্‌বার জন্তেই কবিতা। অথচ সেই কবিতা ছাপা হ'য়ে বেরোয়, পড়্‌তে পারে যে-কেউ, মন্তব্য কর্‌তে পারে যেমন খুসি—তখন আর লজ্জা করে না। ভারি মজা।'

'বিশ্রী লাগে বই কি একটু। আমি তো অন্তত কবিতা ছাপা হওয়া পছন্দ করি নে। দান্তের সময়ে বেশ ছিলো: একজন কবিতা লিখে-লিখে খামে ভরে' পাঠাতো তা'র কবি-বন্ধুদেরই কাছে। এম্‌নি অদল-বদল হ'তো পরস্পরে—যথেষ্ট প্রচার। এখন ছাপাখানা জাত মেরেছে কবিতার। আমার এক-এক সময় ইচ্ছে

করে, একটা কবিতা লেখা হ'লে সেটা বাছা-বাছা দু'চারজনকে পাঠিয়ে দিই—নিজেরাও যাঁ'রা কবি। আর কারো তা দরকার করে না পড়্‌বার।'

'আমার তো মনে হয়, এক ধরণের কবিতা একজন লোক পড়্‌লেই যথেষ্ট।'

'দুঃখের বিষয়,' পার্থপ্রতিম মুচ্‌কি হাস্‌লো, 'এমন প্রায়ই হয় যে সে-লোকের পক্ষে কবিতা আর প্রলাপ একই কথা। দান্তের বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে যদি সব জানা যেতো—'

'আপনার ক্ষেত্রে, আশা করি, তা অন্য রকম।'

'হ্যাঁ—এ-কবিতার বেলায়, অন্তত, তা-ই তো দেখা গেলো।'

শ্রীলতা ভুরু কুঁচ্‌কোলে।—'আপনি এ-কথা বল্‌তে চান্ না যে—'

'হ্যাঁ, আপনি,' পার্থপ্রতিম উচ্চস্বরে হেসে উঠ্‌লো, 'সত্যি বল্‌তে, কবিতাটা আপনাকে লেখা। কিছু মনে কর্‌বেন না—এতে এতটুকু কিছু এসে যায় না।'

শ্রীলতা একটু চুপ করে' রইলো। তারপর বল্‌লে, 'আমি অনেকদিন মনে-মনে ভেবেছি, কবিতার উদ্দিষ্টা হ'তে না জানি কেমন লাগে। এখন জান্‌লুম।'

'কেমন আবার লাগ্‌বে। ওতে তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না।'

'কিন্তু আমি বরাবর ভেবে এসেছি যে ব্যাপারটা খুব থ্রিলিং।'

'তা'তে কোনো ক্ষতি হয় না, আর যা-ই হোক্। আমি ঘরে বসে' আপনার প্রতি যত খুসি কবিতা লিখ্তে পারি—আপনি যা আছেন, তা-ই থাক্বেন। আপনার একচুল ক্ষতি নেই: আমার লাভ প্রতি পদে—প্রতি লাইনে।'

'বা রে, আমাকে ভাঙিয়ে আপনি ফাঁকের উপর লাভ করে' নেবেন—আমি কেন তা সইতে যাবো?'

'কিন্তু আমিই বা কী করে' ক্ষতিপূরণ কর্তে পারি? কবিতা বেচে যদি পয়সা হ'তো আমাদের দেশে, না-হয় তা থেকে একটা পার্সেন্টেজ দিতুম আপনাকে। এঁর বেশি আর কী? কলম তো আর থামাতে পারেন না।'

'এ যে দেখ্ছি দস্তুরমত exploitation!'

'দেখুন, আপনি যদি না হ'তেন, তা হ'লে অন্য কেউ হয়-তো হ'তো। রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে একবার দেখেছি, এমন মেয়েকে নিয়েও আমি লিখেছি কবিতা। মনে যদি কোনো কথা থাকে বল্বার, যে-কোনো ছুতো পেলেই তা বেরিয়ে পড়ে। তবু, এবার-কার ছলটা যে আপনি হয়েছেন, সে-জন্য ধন্যবাদ।

আপনার অনুগ্রহে কয়েকটা সত্যিকারের ভালো কবিতা লিখে ফেলেছি।'

'চমৎকার! শুন্‌তে-শুন্‌তে মনে হচ্ছিলো, কবিতার কারখানায় আমি যেন একটা যন্ত্র। তা ছাড়া কিছুই নই।'

চেয়ারের পিছনে মাথা হেলান দিয়ে পার্থপ্রতিম হেসে উঠ্‌লো। 'আচ্ছা,' হাসি থাম্‌লে পর নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবে—এমনভাবে, যেন কোনো বিষয়-পরিবর্ত্তন হয় নি—সে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'আপনার কি কখনো মনে হয় নি যে কীট্‌সের কবিতা এত বে শি মিষ্টি...'

দু'খানা চিঠি

পূজোর ছুটি এসে পড়্‌লো। শ্রীলতারা বাড়ির সবাই যাচ্ছে পুরীতে। পার্থপ্রতিমকে সে বল্‌লে, 'এবার আপনাকে আস্‌তেই হবে আমাদের সঙ্গে।'

'দুর্ভাগ্য, পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'আমাকে যেতে হবে সাঁওতাল পরগণার এক শহরে মা-কে নিয়ে।'

সত্যি বল্‌তে, এক মিনিট আগেও কিছু ঠিক ছিলো না; ঝাঁ করে' বলে' ফেল্‌লো যা এলো

মুখে। আর বল্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে তা যেন সত্যি-সত্যি ঠিক হ'য়ে গেলো। হ্যাঁ, সাঁওতাল পরগণাতেই সে যাবে—সেখানে তা'র মামা ডাক্তারি করেন, তিনি অনেকদিন থেকে তা'কে লিখ্‌ছেন একবার আস্‌তে। তাঁর বাড়িটা নাকি শহর ছাড়িয়ে, ভদ্রলোকের বসতি ছাড়িয়ে, ধূ-ধূ ফাঁকার মাঝখানে—মনে হয় যেন পৃথিবীর শেষ সীমায়। সাম্‌না দিয়ে গেছে গেরুয়া রঙের এক পাহাড়ি নদী—পাথর থেকে পাথরে লাফ দিয়ে-দিয়ে অনায়াসে যা পার হ'য়ে যাওয়া যায়। মন্দ মজা হবে না, পার্থপ্রতিম ভাব্‌লে।

শ্রীলতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে তাকালো তা'র মুখে। 'এখন পর্য্যন্ত,' হঠাৎ সে জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'কেন আপনি আমাদেরকে ঠিক মেনে নিতে পার্‌ছেন না?'

পার্থপ্রতিম হাল্‌কা সুরে বল্‌লে, 'কারণটা যদি খুঁজে বা'রও করি, তা'তে কিছু এগোবে বলে' মনে হয়?'

শ্রীলতা চুপ করে' রইলো। সে হয়-তো ভেবে-ছিলো যে পার্থপ্রতিমে ভদ্রতার খাতিরেও একবার প্রতিবাদ কর্‌বে।

পার্থপ্রতিমই আবার বল্‌লে, 'আশা করি আপনাকে ক্ষুণ্ণ কর্‌লুম না।' কিন্তু শ্রীলতাদের সঙ্গে পুরী যাওয়ার

প্রস্তাবে তা'র মন যে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না—তাদের সঙ্গে অতটা কাছাকাছি, ঘেঁষাঘেষি তা'র ভাব্‌তেই কেমন-যেন খারাপ লাগ্‌লো।

শ্রীলতার চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌লো হাসি। আস্তে-আস্তে সে বল্‌লে, 'আসল কথাটা আমি জানি—আপনিও জানেন। আপনি আমাদের মনে করেন অন্য জাতের, অন্য জগতের। কিন্তু তাই বলে' এতটা পিঠ-চাপ্‌ড়াবার দরকার করে না।'

পার্থপ্রতিম কথাটাকে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে' দিলে হাসি দিয়ে। 'আসুন্‌ অন্য কোনো কথা বলি,' একটু পরে সে বল্‌লে।

সাঁওতাল পরগণার আকাশ এত নীল যে চেয়ে দেখ্‌লে বিশ্বাস হয় না। তা'র দিকে তাকিয়ে, এক দুপুরবেলায় জান্‌লার ধারে ইজি চেয়ারে বসে' পার্থ-প্রতিম গা ছেড়ে দিয়েছে আলস্যের বিলাসে, এমন সময় তা'র নামে এই চিঠি এলো শ্রীলতার কাছ থেকে।

'এখানে এসে,' শ্রীলতা লিখেছে, 'ক'দিন খালি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সমুদ্রের যা চেহারা, তাকানো যায় না। সারাক্ষণ চটে' আছে; শাদা-শাদা দাঁত বা'র করে' তেড়ে আস্‌ছে—যেন গিলে খাবে বিশ্ব-সংসার। কালো জল; শিষের রঙের আকাশ; ছুঁচের মত সরু-

সরু মুখে প্রায়-অদৃশ্য বৃষ্টির ফোঁটা। যেন আত্মা পর্য্যন্ত স্যাঁৎসেঁতে হ'য়ে গেছে। ঘরে বসে-বসে' শুধু শুনেছি সমুদ্রের গর্জ্জন, আর ভেবেছি, না এলেই হ'তো এখানে; যে-কোনো সময়ে, বাড়িতে থাকাই সব চেয়ে ভালো। প্রতি বছর এই নিয়ম করে' বেরুনো, বাস্তবিক—শেষ পর্য্যন্ত এতে একটু ক্লান্তি আসেই।

'ছুটিবিলাসীরা সব দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠ্‌লো। বীচের ভিড় পাৎলা; যা'রা প্রাণসংশয় করে'ও স্বাস্থ্য ভালো কর্‌বে পণ করেছে, তা'রাই শুধু দু' একটা করে' ডুব দিচ্ছে এমন বদ্‌মেজাজি সমুদ্রে। লোকে বলাবলি কর্‌ছে, এমন খারাপ ওয়েদার এ-সময়ে পুরীতে কখনো হয় না—সীজ্‌ন্‌টাই এবার মাটি হ'য়ে গেলো। আমরা গরমের দেশের লোক—সূর্য্য না হ'লে আমাদের প্রাণ বাঁচে না। যে-সূর্য্য আমাদের চর্ম্মকে করেছে এমন মসৃণ শ্যামল, তা'রই মধ্যে আমাদের প্রাণের উৎস। এ কী বিশ্রী ঘেরাটোপ-দেয়া আকাশ—সমস্ত পৃথিবীটারই যেন অসুখ করেছে, সে শুয়ে আছে জড়োসড়ো হ'য়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে।

'ঈশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন, আজ উঠেছে রোদ। আকাশের গায়ে এখনো লেগে রয়েছে টুক্‌রো-টুক্‌রো ছেঁড়া মেঘ, কিন্তু যেখানে নীল বেরিয়ে পড়েছে, সে

একটা মির‍্যাক্‌ল্। সমুদ্র আজ বেজায় খুসি—শেষ নেই ওর ছেলেমানুষির। হাত-পা তুলে লাফাচ্ছে আর চ্যাঁচাচ্ছে আর লুটিয়ে পড়্‌ছে মুখ থুব্‌ড়ে। বীচ থেকে উচ্চহাসির স্বর আস্‌ছে ভেসে। এক মোটা ভদ্রলোক সাঁতারের পোষাক পরে' আস্তে-আস্তে যাচ্ছেন সমুদ্রের দিকে—ঠিক Oxo-র বিজ্ঞাপনের মত দেখ্‌তে। একপাল ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে খিল্‌খিল্ করে' হাস্‌তে-হাসতে ছুটে যাচ্ছে বালির উপর দিয়ে—একজন পড়্‌লো হোঁচট খেয়ে। আমি ভেবেছিলুম, সে কাঁদ্‌বে, কিন্তু সে উঠে আরো বেশি জোরে হাস্‌তে-হাস্‌তে একমুঠো বালি তুলে ছুঁড়ে দিলে এগিয়ে-যাওয়া সঙ্গীদের উদ্দেশে। খুসির ধুম পড়ে' গেছে চারদিকে। বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে'-বসে' দাদা পাইপ টান্‌ছেন, পরিচিত গন্ধ পাচ্ছি। পাশের ঘর থেকে বৌদির গুন্‌গুনানি : অনুমান কর্‌ছি, তাঁর হাতে কোনো সেলাইয়ের কাজ। জান্‌লা দিয়ে একটু চৌকো রোদ এসে পড়েছে আমার পায়ের কাছে—মাঝে-মাঝে নিবে যাচ্ছে, যেমন মেঘ ঢাক্‌ছে সূর্য্যের মুখ—যেন একটা বেড়াল আদরের লোভে পায়ের কাছে এসে সাড়া না পেয়ে সরে'-সরে' যাচ্ছে। আমি বসে' আছি : দেখ্‌ছি ; শুন্‌ছি ; শুঁক্‌ছি। সকাল থেকে আমাকে

আলস্যে পেয়েছে: কখন্ থেকে ভাব্ছি নাইতে যাবো সমুদ্রে; উঠ্তে আর ইচ্ছে কর্ছে না। শেল্ফের উপর রয়েছে ম্যাক্স্ বিয়ারবোমের ভারি মজার গল্পের বই: আদ্ধেকটা পড়েছি, বাকিটা পড়্তে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে—তবু, হাত বাড়ালেই যদিও বইটা পাই, হাত বাড়ানোই হ'য়ে উঠ্ছে না। সময় আল্‌গোছে, অলক্ষিতে খসে'-খসে' পড়ে' যাচ্ছে, কিছুই হচ্ছে না। মানুষ সুখ খোঁজে, আমোদ খোঁজে; ভালো লাগ্বে বলে' এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় ছুটোছুটি করে, ওড়ায় পয়সা, বাড়ায় সরঞ্জাম; কত তা'র আয়োজনের ঘটা, কী তা'র দাপাদাপি! কিন্তু এই যে নিজের মনে চুপচাপ বসে' থাকা, কিছু-না-করায় ভরে'-ওঠা সকালবেলা—ঐটাই বা কি কম? আমার এই আলস্যের নেশা থেকে আপনাকে চিঠি লিখ্ছি: আপনি এখন কী কর্ছেন?

'ছুটিতে বেড়াতে এসে যাদের সঙ্গে সাধারণত দেখা হয়, তা'রা কেউ আবির্ভূত হয় নি—এখন পর্য্যন্ত নয়। ভাব্ছি, পুরী কি জাতে নেমে গেছে সৌখিন সমাজে, তবু ভিড় তো কিছু কম দেখি নে। কিন্তু তা'রা বোধ হয় এ-ক'দিন চাপা পড়ে' ছিলো বৃষ্টিতে—এইবার বেরুবে এক-এক করে', গর্ত্তের ভিতর থেকে

রোদ-পোহাতে-আসা চক্‌চকে, শ্লথগতি সাপের মত।
(উপমাটা ঠিকই হয়েছে : মনে করে' দেখুন তাদের শাড়ির ঝল্‌মলানি—আর কী-রকম পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে শরীরটাকে জাপ্‌টে ধরে' তা উঠে গেছে পায়ের গোড়ালি থেকে বুক পর্য্যন্ত, তারপর হঠাৎ সরে' গিয়ে পিছ্‌লে পড়েছে বাঁ কাঁধের উপর—কোথায় লাগে তা'র কাছে সাপের খোলস!) ইতিমধ্যেই একজন এসেছিলেন—আমাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটা গোলাপি রঙের গোল বাড়িতে তাঁরা থাকেন—একেবারে—এইবার অবহিত হোন্—আস্ত, জ্যান্ত এক আই-সি-এস্-এর বৌ—তিনি (মানে, আই-সি-এস্‌টি) আবার গল্প লেখেন! তিনি (মানে, আই-সি-এস্-পত্নী) বল্‌লেন, সমুদ্রটা "aw—f'ly dull," লোকে যে কী দেখ্‌তে পায় এর মধ্যে! আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম, "কই, সবাই তো পায় না" ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুবুদ্ধি হ'লো : খসে' পড়লুম সেখান থেকে। ভাগ্যিস বৌদি ছিলেন। পৃথিবীতে বৌদির অস্তিত্বের জন্য মাঝে-মাঝে এত কৃতজ্ঞ বোধ কর্‌তে হয়।

'মোটের উপর, এখন পর্য্যন্ত বল্‌তে গেলে একাই কাটাচ্ছি। একা : কথাটা আমার পক্ষে বরাবর ভয়ের মত ছিলো—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে একা থাকাটাও

বেশ ভালো: হাঁশফাঁশ করা, ছট্‌ফট্‌ করা—মস্ত কীর্ত্তির ইমারৎ গড়ে' তোলা যেমন অনেকখানি, চুপ করে' থাকা, কিছু না করা—সেটাও কিছু কম নয়। মনে হচ্ছে, ছুটি নিতে আমরা যেখানে আসি—যে-সব সরকারি সখের জায়গা—সেখানে এসে তো সেই কল্‌কাতারই জীবন, খামকা শুধু ম্যাপের এক ডট্‌ থেকে অন্য ডটে সরে' এলুম। ছুটিটা হবে মনের, শুধু ক্যালেণ্ডারের লাল তারিখের নয়। যদি দেশসুদ্ধ লোকের একই দিনে ছুটি না হ'তো, তা হ'লে এত ঠেলাঠেলি হ'তো না; আর তা হ'লেই মানে হ'তো ছুটির। পুরীতে আস্‌তে চান্‌ নি বলে' আপনার সুবুদ্ধির তারিফ করছি: অনেক ভালো সাঁওতাল পরগণার জঙ্গল—হওয়া উচিত, অন্তত; কারণ সেখানে এমন-কোনো বিখ্যাত জিনিস নেই যা'কে "aw f'ly dull" বলে' আই-সি-এস্‌-গৃহিণী আমাদেরকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন।

'সেই জঙ্গলে বসে' আপনি কি বেন্‌ জন্‌সন্‌-এর ডিস্‌কভারিজ্‌ পড়ছেন, না কি, ডুব দিচ্ছেন রবার্ট্‌ হেন্‌রিসনের এখানে-ওখানে—শুধু দেখ্‌তে, কেমন—না কি মেরেডিথের জটিলতরো কবিতার সঙ্গে কুস্তি করছেন? না কি, মুখ বদ্‌লাবার জন্য গ্রীক নাটক,

এবার? কী লিখ্‌ছেন? যদি কোনো আলগা কবিতা পড়ে' থাকে আপনার হাতের কাছে, যা'তে আপনার দরকার নেই, চিঠির সঙ্গে ভরে' পাঠিয়ে দেবেন আমাকে? হঠাৎ ইচ্ছে কর্‌ছে পড়্‌তে।'

পার্থপ্রতিম চিঠিটা একবার পড়্‌লে, দ্বিতীয়বার পড়্‌লে; তারপর তক্ষুনি কাগজ-কলম নিয়ে লিখে ফেল্‌লো উত্তর:

'পুরীতে গিয়ে আপনার খুব ভালো লাগ্‌ছে জেনে খুসি হলুম। আমার এত ভালো লাগ্‌লো আপনার চিঠি পড়্‌তে—তা-ই থেকে বুঝ্‌তে পার্‌ছি। সব জড়িয়ে নিশ্চয়ই চমৎকার—সমুদ্র আর আই-সি-এস্-এর বৌ—আর যা-কিছু আপনি লিখেছেন। আর, সঙ্গীও আপনার জুট্‌বে—যথাসময়ে। মানুষকে কথা কইতেই হয়—অন্তত, মাঝে-মাঝে। সম্প্রতি, বাক্য-হীনতার চাপে আমি মারা যাচ্ছি। বিশেষ, আপনার চিঠি পড়্‌বার পর কথা কইবার ইচ্ছা যেন একটা ব্যাধির সামিল হ'য়ে উঠ্‌ছে। মানুষ ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করে—আবার মানুষ না হ'লেও প্রাণ আইঢাই করে; কোনোদিকেই নিস্তার নেই। জীবনটা এমন জট-পাকানো!

'এখানে এমন নির্জ্জন আর রাত্রি এত গভীর আর

তারাগুলো এমন করে' তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে— আশ্চর্য্য। আমাদের মানুষদের কাজ আর ভাবনা, কথা আর জল্পনার পরিধির বাইরে যে রহস্যে আব্-ছায়ায় গুঞ্জনে ইঙ্গিতে বিশাল এমন এক জগত রয়েছে, তা আমরা সাধারণত টের পাই নে; কিন্তু যখন পাই, কেমন একটু চম্‌কে উঠ্‌তে হয়। কখনো ভাবি নি, রাত্রি এত কাছে এসে এমন নিবিড় করে' চেপে ধর্‌তে পারে বুকের উপর, কথা কইতে পারে কানের কাছে মুখ রেখে—কী কথা, তা ঠিক বুঝি নে, শুধু একটু যেন ভয় করে শুন্‌তে, তা'র চেয়ে বেশি ভালো লাগে। এই রাত্রি একটা মহান উপস্থিতির মত, আকাশে-আকাশে ছড়িয়ে-যাওয়া এই জমাট অন্ধকার— আর কী অন্ধকার! আমাদের শহুরে চোখে এই অন্ধকারই মনে হয় যেন কতকালের হারিয়ে-যাওয়া একটা জিনিস ফিরে পেলুম। রাত্তিরে খোলা জান্‌লার দিকে তাকালে—ঠিক যেন কেউ একটা মিশ্‌কালো পর্দ্দা টাঙিয়ে রেখেছে সেখানে, এম্‌নি লাগে চোখে। সবুজ আলোর হিজিবিজি নক্সা কেটে যায় জোনাকির দল—অবাক হ'য়ে আমি তাকিয়ে থাকি। ঝিঁ ঝিঁ ডাকে একঘেয়ে সুরে, যেন সন্ধ্যার পৃথিবীর বুকের ভিতর থেকে উঠ্‌ছে ক্লান্তির করুণতা। আর, এখানকার

রাত্রিতে কত রকম শব্দ, দূরের বন থেকে ভেসে আসে অস্পষ্ট মর্ম্মর, পাখী উড়ে যায় ডানার ঝট্‌পটানির ঢেউ তুলে, ঘাসের মধ্যে খস্‌খস্‌ করে' দ্রুতগতিতে কী চলে' যায়—অথচ সব মিলিয়ে এমন-এক স্তব্ধতা, যা'র সীমা নেই, যা'র কাছে এসে বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়। (প্রসঙ্গত, প্রকৃতির খুব নিবিড় মাখামাখিতে, দেখা যায়, শেষ পর্য্যন্ত মানুষই পরাস্ত হয়; যাদেরকে বলা যেতে পারে প্রকৃতির জীব, তা'রা কখনো সভ্যতার কোনো স্তরে উঠ্‌তে পারে নি, এবং—অতীত ইতিহাস দিয়ে বিচার কর্‌তে গেলে, পার্‌বেও না। কেন যে সাঁওতাল পরগণার আর মধ্যপ্রদেশের আর আসামের অভ্যন্তরের লোকরা কখনো অসভ্যতা কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লে না, এই রাত্রির দিকে তাকালেই তা বুঝ্‌তে পারি। মানুষের পক্ষে এটা বড় বেশি—বড় বেশি। ভারতবর্ষের সভ্যতা গড়ে' উঠেছে গঙ্গার ধারে-ধারে: সেখানে তা'রা প্রকৃতিকে পেয়েছে প্রথমত সব প্রয়োজন মেটাবার দাসী হিসেবে—তারপর অবসর সময়ে নিয়ে একটু বিলাস করবার প্রেয়সী রূপে। গঙ্গার ভিতর দিয়ে প্রকৃতি দেখা দিয়েছে সঙ্কীর্ণ হ'য়ে, পরিমিত হ'য়ে, মানুষের ভোগের উপচার হ'য়ে। যেখানে তা হয় নি, মানুষ যেখানে

মিশে আছে প্রকৃতির সঙ্গে তা'র একটা অংশ হ'য়ে, সেখানে বল্‌তে গেলে মানুষই নেই। ইকুয়েটরিয়ল আফ্রিকার বাসিন্দা আর এস্কিমোদের কথা ভাবুন্‌।')

'বাড়ির কাছে আছে একটা নদী—খাতির করে' তা'কে নদী বল্‌তে হয়—নাম তা'র চল্‌নি। জানি নে, এ-নাম এখানকার বাঙালিদেরই দেয়া কিনা, কিন্তু সে যে চলে, তা ঠিক। এই তো ছোট্ট দেখ্‌তে, অথচ কী তা'র স্রোত—যেন কোথায় গিয়ে পৌঁছতে হবে এক্ষুনি, একটু সময় নেই। হাসি পায় দেখে, ছোট মেয়ের যেন গিন্নি-গিন্নি খেলা। মাঝে-মাঝে বড়-বড় কালো পাথর মাথা উঁচিয়ে আছে—তা'তেই চলে সাঁকোর কাজ; আর সন্ধেবেলা হয়-তো কোনো সাঁওতাল মেয়ে এসে বসে তা'র উপর লাল্‌চেঁ, ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে।

'এ-নদী কোনো কাজেই লাগে না; জল-ভরা এর বালি; আর এত কম জল যে সব চেয়ে যেখানে গভীর সেখানে হয়-তো কোমর ডোবে না, তবু নাম্‌বার উপায় নেই স্রোতের তাড়নায়। এ শুধু চল্‌তে-চল্‌তে হেসে ওঠে খিল্‌খিল্‌ করে', তা'র জলে পা ডুবিয়ে বসে'-থাকা সাঁওতাল মেয়েরই মত। এ শুধু দেখ্‌তে সুন্দর—আর সেটা অবিশ্যি কম কথা নয়।

'কাল বিকেলে চল্‌নির ধারে গিয়ে দেখি, হল্‌দে রঙের

একটা সাপ পড়ে' আছে নিঃসাড় হয়ে, রোদ চিক্‌চিক্‌ কর্‌ছে তা'র গায়ের খোসায় ; টান, যেন একটা কাঠি ; বিছিয়ে দিয়েছে মসৃণ, ঝক্‌ঝকে শরীরটাকে সূর্য্যের নিচে। অন্য সময় হ'লে আমি নিশ্চয়ই ভয় পেতুম, তাড়াতাড়ি পালিয়ে আস্‌তুম সেখান থেকে। কিন্তু তখন, আমি যেন মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলুম—টান-করে'-মেলে ধরা তা'র উজ্জ্বল শরীরের দিকে, শান্ত-সোনালি বিকেলে মিলিয়ে-যাওয়া তা'র গভীর, গভীর তৃপ্তির দিকে। সে একটুও নড়্‌ছিলো না—একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমি দেখ্‌তে লাগ্‌লুম—তা'র ছোট্ট সোনালি মাথা থেকে লেজের ডগা পর্য্যন্ত একেবারে স্তব্ধ। এখন একটা ঢিল তুলে নিয়ে মাথা সই করে' মার্‌লেই—ব্যস্‌। কিন্তু আমার তখন মনে হ'লো, ওকে আমি কেন মার্‌তে যাবো ? আমি ওকে মার্‌বার কে ? এই সূর্য্যের উপর অধিকার আছে আমারই মত : ওর জীবন ঠিক ততটাই ওর, যতটা আমার জীবন আমার। আমি হঠাৎ নিজকে আবিষ্কার কর্‌লুম ঐ সাপের সঙ্গে অস্তিত্বের এক স্তরে, সূর্য্য-প্রার্থী, প্রাণ-লোলুপ। সেখানে তা'র সঙ্গে আমার যদি কিছু প্রভেদ থাকে, তা শুধু এই যে তা'র রঙ্‌ সুন্দর সোনালি, আর আমার ম্যাট্‌মেটে তামাটে। তুলনায় ঠক্‌বো আমিই।

'খানিক পরে সাপটা একটু নড়ে' উঠ্‌লো, তারপর শ্লথ, অলস গতিতে এঁকে-বেঁকে চলে' গেলো একটা ঝোপের আড়ালে, আমার দৃষ্টির বাইরে। সে চলে' গেলো বলে' আমি খুসি হলুম; আরো খানিকক্ষণ থাক্‌লে হয়-তো বস্‌তুমই একটা ঢিল ছুঁড়ে। সাপটাও যেন আমার দিকে একবার চেয়েও দেখ্‌লে না, ভয় পেয়ে পালাচ্ছে, এমন-কোনো লক্ষণও দেখ্‌লুম না। অনেক জায়গা এখানে; অনেক আলো; অজস্র সূর্য্য; দরকার করে না কাড়াকাড়ি, মারামারি কর্‌বার। যে-সাপ ভয়ঙ্কর, যা'কে চোখে দেখ্‌লেই আঁৎকে উঠ্‌তে হয়, এখানকার এই সোনায়-নীলে ঝলোমলো আকাশের নিচে, দিগন্তে লুটিয়ে-পড়া মাঠের মাঝখানে, হাসিতে আলোতে চঞ্চল এই চল্‌নি নদীর ধারে তা'কে এমন সুন্দর মানিয়ে গিয়েছিলো যে অনায়াসে মনে করা যেতো সে এক স্থানীয় দেবতা, কোন্ গহ্বরের উষ্ণ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে মুহূর্ত্তের জন্য চুপে-চুপে, নিয়ে এসেছে কোন্ নিবিড়, গহন প্রাণ সূর্য্যের কাছে। খামকা নয়, দক্ষিণের আদিমদের প্রধান দেবতা যে সাপ।

'এখন দুপুর। ঝাঁ-ঝাঁ করছে আকাশ; অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে চল্‌নির ছল্‌ছলানি। খাওয়ার পর ইজি-

চেয়ারে বসে'-বসে' একটু তন্দ্রার মত এসেছিলো, রোধ করবার চেষ্টা করি নি। এখানে বসে' কেবলই মনে হচ্ছে, অনেক সময় আছে, অনেক সময় আছে। দু'হাতে অনায়াসে ছড়ানো যায়, এত সময়। তাড়া নেই কোনো-কিছুর। এখানে খবরের কাগজ আসে বাসি হ'য়ে; আমি তা ছুঁইও নে। সময়ের বাইরে চলে' যেতে বেশ লাগে; বর্ত্তমানের প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চল্‌বার চেষ্টা কেনই বা—পিছিয়ে পড়া বেশ, খুব ভালো থম্‌কে দাঁড়ানো, নিশ্চয় উদাসীনতায় হারিয়ে যাওয়া। আস্‌বার সময় বাক্সে জায়গা ছিলো না বলে' শুধু একখানা বই নিয়ে এসেছি—পাৎলা কাগজের এক ভল্যুম সুইফ্‌ট্‌। হাতের কাছে যেটা পেয়েছি, বাছ-বিচার করি নি। তা ছাড়া, ভেবেছিলুম, বই নিয়েই যাচ্ছি, পড়া আর হবে না। বই ঘেঁটে-ঘেঁটে প্রায় ঘেন্না ধরে' গিয়েছিলো। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি বই-ই আমাদের একমাত্র ত্রাতা। বেচারা সুইফ্‌ট্‌কে তুলো ধুনে ফেল্‌লুম। বাড়িতে কতগুলো বাঁধানো মাসিকপত্র আছে; তাদেরই দু'একটা করে' পাতা ওল্টাই, পাছে চট্‌ করে' ফুরিয়ে যায়। এমন জিনিস পড়্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে, এখানকার নিঃঝুম নিরিবিলির সঙ্গে যা মানিয়ে যায়: গল্প নয়, না, কবিতাও নয়—বাঁধা-ধরা যে-সব

ফর্ম্ আছে, তা'র কোনোটাতেই মন ঠিক সাড়া দিতে পার্‌ছে না। এমন লেখা, যা বেসরকারি, যা নিরুদ্দেশ, যা দৈবাৎ এসে পড়েছে কোনো খেয়ালের ঝোঁকে—যা বিশেষ কোনোখানেই নিয়ে যায় না, অগোছালভাবে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। ও-রকম অনেক বইয়ের নাম মনে পড়্‌ছে, তাদের একখানাও যদি থাক্‌তো এখন আমার কাছে! মনে-মনে ভেবেই সুখ পাচ্ছি। আপনি চেয়েছেন আমার কবিতা পড়্‌তে, কিন্তু, হায়, আমার লেখার তাড়া সব রয়ে' গেছে কল্‌কাতায়; একটা টুক্‌রো নেই যে আপনাকে পাঠাতে পারি। নতুন ক'রে' যে লিখে দেবো, তাও চট্‌ ক'রে' হ'য়ে উঠ্‌বে না—আকাশ দেখে-দেখেই কেটে যাচ্ছে সময়।'

প্রস্তাবনা

এখানে ছেড়ে যাচ্ছি অনেকগুলো মাসের অবান্তরতা। ইতিমধ্যে ওরা এম্-এ পরীক্ষার বেড়া ডিঙিয়ে নিরাপদে এসে অবতীর্ণ হ'লো প্রথম শ্রেণীর নরম মাটিতে: দু'জনার মাঝখানে রইলো অনেকগুলো নম্বরের জমি।

উঠে বসে', গা হাত পা ঝেড়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তা'রা মুচ্‌কি হাস্‌লো। মজা মন্দ নয়।

ফল যা হ'লো, কোথাও কোনো বিস্ময়ের উদ্রেক কর্‌লে না। ইউনিভার্সিটির সবাই বলাবলি কর্‌লে, 'জান্‌তুম!' পার্থপ্রতিমকে কেউ আমলের মধ্যেই আন্‌লে না: শ্রীলতার ছবি বেরুলো প্রবাসীতে ও কোনো-কোনো মেয়েদের মাসিকে। সে সৃষ্টি কর্‌লে একটু চাঞ্চল্য সাময়িক পত্রের পাঠকদের মধ্যে: ফোটোগ্রাফটা ছিলো ভালো।

যা'র উপর পার্থপ্রতিম মন্তব্য কর্‌লে, 'শিম্পাঞ্জিকে চুরোট খেতে দেখ্‌লে আমরা এম্‌নি বাহবা দিই। আপনার আপত্তি করা উচিত।'

শ্রীলতা বল্‌লে উত্তরে: 'ছাড়া যে পেয়েছি, সেই আনন্দে পার্‌ছি ক্ষমা কর্‌তে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—এবং আপনাকে।'

পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'যে-কোনো কাজ—যতই তা তুচ্ছ হোক্‌, অর্থহীন হোক্‌—ভালো করে' কর্‌তে পার্‌বারও একটা আনন্দ আছে বই কি।'

শ্রীলতা বল্‌লে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে: 'কী আরাম, ভাবুন একবার—এতদিনে অধিকার পেলুম শুধু সেই সব বই পড়্‌বার, যা ভালো লাগে পড়্‌তে। এখন বুঝ্‌তে

পার্‌বো, কোন্‌টা লোকে ভালো বলে বলে' ভালো মনে করি, আর কোন্‌টা ভালো লাগে আমার নিজের।'

'মস্ত লাভ!' পার্থপ্রতিম সায় দিলে, 'তা'রই জন্যে সার্থক এতদিনের এত সব ঝক্‌মারি।'

ছাত্ররা যা'রা দেখ্‌ছিলো দূর থেকে সকৌতুকে এই অ্যাকাডেমিক ঝাঁপ, তা'দের মধ্যে কেউ-কেউ আশা করেছিলো—দুরাশা করেছিলো, বলা যায়—যে শেষ পর্য্যন্ত পার্থপ্রতিম নেমে যাবে—তা হ'লে কথা বল্‌বার মত কিছু হ'তো বটে! কিন্তু যা ভাবা গিয়েছিলো, তা-ই যখন ঘট্‌লো, তাদেরকেই দেখা গেলো সব চেয়ে উল্লসিত; 'হাজার হোক্‌, মেয়ে তো!' তা'রা বল্‌লে, 'কত আর হবে!' অক্ষুণ্ণ রইলো তাদের পৌরুষের মান; বাঁচ্‌লো তা'রা হাঁফ ছেড়ে।

এক সকালে চায়ের টেবিলে বসে' শ্রীলতার দাদা কুমুদনাথ কথায়-কথায় বল্‌লেন, 'শ্রীলতার এইবার বিয়ে কর্‌লে ভালো হয়।'

নিজের নাম উচ্চারিত হ'তে শুনে শ্রীলতা ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের পাতা থেকে চোখ তুলে তাকালো।

মানসী, শ্রীলতার বৌদি, নিজের পেয়ালায় আরএকটু চা ঢাল্‌ছিলেন: হাত থেকে পাত্রটা নামিয়ে রেখে বল্‌লেন, 'যত দিন যাচ্ছে, বিয়ে ব্যাপারটা শক্ত

হ'য়ে উঠ্ছে ততই। এমন-কোনো ছেলেই নেই, যা'র কথা ভাবা যায়।'

কুমুদনাথ বল্লেন, 'একটা বয়েস আছে, যা'র পরে মেয়েদের বিয়ে না কর্লে আর মানায় না।'

'আজকালকার ছেলেদের যেন কী হয়েছে, বিয়ে কর্তেই চায় না—আর যা'রা চায়, তাদের চাওয়াতে কিছু এসে যায় না।' মানসী তাঁর মন্তব্য নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলেন।

'সাহস পায় না, বলো।'

কুমুদনাথের মন চলে' গেলো কয়েক বছর আগে, যখন বিলেত থেকে বীমা-কোম্পানির নবিশির পালা সেরে দেশে এসে তাঁর দেখা হয়েছিলো মানসীর সঙ্গে। প্রথমটায়, তিনিও পান্ নি সাহস। তাঁর কাছ থেকে বড় বেশি আশা করা হচ্ছে, তিনি অনুভব করেছিলেন। প্রতি পদে যেন তাঁকে নেয়া হচ্ছে বাজিয়ে: মানসীর পরিবারে তাঁর যেটুকু খাতির, সবই বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, নির্দ্দিষ্ট একটা পরিণতিকে লক্ষ্য করে', তা থেকে কখনো তিনি এতটুকু ভ্রষ্ট হয়েছেন বলে' যদি সন্দেহ করা যায়, তা হ'লে—তা হ'লে মুহূর্ত্তের মধ্যে সব জমে' যাবে বরফ হ'য়ে। মোটের উপর, ব্যাপারটা আরামের নয় মোটেও; আরামের নয়, সব

সময় সতর্ক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরীক্ষার নিচে থাকা; সব সময় মনে করে' রাখা যে-দায়িত্ব তা'কে গ্রহণ কর্‌তে হবে বলে' নীরব বোঝাপড়া। ব্যাপারটা দস্তুর-মত মন-খারাপ-করে'-দেয়া—কষ্টের, প্রায়। বল্‌তে গেলে বল্‌তেই হবে যে এ হচ্ছে 'প্রেম করা,' কিন্তু তা'তে মজা ছিলো না কোনো: ঠিক যেন আঁটোসাটো, শুক্‌নো এক টুক্‌রো কর্ত্তব্য, যা কর্‌তে হয় নিজের গরজে নয়, লোকমতের খাতিরে। আর এ-ই যে চল্‌বে ভালোবাসার নামে, কুমুদনাথ তা'তে মনে-মনে শক্‌ড্ হয়েছিলেন: সারাটা সময় নিজকে তাঁর অসম্ভব বোকা-বোকা মনে হয়েছিলো। বিয়ে করে' তিনি বাঁচ্‌লেন। মেয়েটি—মহিলাটি, বলা উচিত—যেন হাত পা গুটিয়ে বসে' আছেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে—দরজায় কড়া পাহারা। প্রার্থী এলো, বা'র কর্‌লে পকেট থেকে তা'র টিকিট—তা'র পরিচয় আর সুপারিশের চিঠি; অনেক তা'র যাচাই, দীর্ঘ তা'র পরীক্ষা; তারপর সে-সব যদি কপালগুণে পেরোতে পার্‌লো তো মেয়েটি মনে-মনে মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে অলসভাবে মাথা এলিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, 'হ্যাঁ।' একে, আর যা-ই হোক্, 'প্রেম-করা' বলে না।

স্বামীর অন্যমনস্ক মুখের দিকে তাকিয়ে মানসী

বল্‌লেন, 'সাহস যদি না পায় তো সাহস দিতে হবে।'

শ্রীলতা ছিলো এতক্ষণ চুপ করে,' এইবার বলে' উঠ্‌লো, 'তোমরা দু'জনে মিলে তা হ'লে ঠিক করে' ফ্যালো আমার ভাগ্য।' তা'র কথার সুরে ছিলো ঝাঁঝ, আর সেই সঙ্গে পরিহাসের লঘুতা—যা'র অভাবে ঝাঁঝ তেতো হ'য়ে উঠ্‌তে পার্‌তো।

টেবিলের উপর দু' কনুই আর গালের উপর দু'-হাত রেখে কুমুদনাথ তাঁর সাম্‌নের বাসনের উপর আধ-খাওয়া রুটির টুক্‌রোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন: চোখ তুলে হাস্‌লেন শ্রীলতার দিকে। তিনি আশাই করেছিলেন যে শ্রীলতা এ-রকম কোনো মন্তব্য কর্‌বে। বোনকে তিনি জান্‌তেন ভালো করে'ই: সে যখন বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যায়, তখন থেকেই তাঁর উপর তা'র ভার। এবং তিনি তা'কে বেড়ে উঠ্‌তে দিয়েছিলেন নিজের ইচ্ছায়, নিজেরই প্রাণের শক্তিতে। যে-ইচ্ছা, যে-খেয়ালিপনা আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কঠোর চেষ্টায় চাপা দিয়ে রাখা হয় প্রতি মুহূর্ত্তে, কুমুদনাথ জান্‌তেন, তা'রই মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবনের উৎস। তিনি যত্ন নিয়েছিলেন সেই ক্ষীণ, সূক্ষ্ম আগুন যা'তে নিবে না যায়। শ্রীলতাকে তিনি

ছেড়ে দিয়েছিলেন, যা'তে সে অবকাশ পায় নিজের মধ্যে নিজে ফুটে ওঠ্‌বার, যা'তে সে বইতে পারে—এবং বইতে চায়—তা'র নিজের দায়। শ্রীলতা কী করে, কোথায় যায়, কী করে' কাটায় সময়, তিনি কখনো তা'র খোঁজ নিতে যেতেন না; কখনো তাঁকে গায়ে-পড়া প্রশ্ন কর্‌তেন না; কখনো বাধা দিতেন না, সন্দেহ কর্‌তেন না। আর তিনি ভালোবাস্‌তেন তা'র মুখের উষ্ণ রঙ্‌, তা'র মুক্ত, ঋজু ভঙ্গী, নিজের মধ্যে তা'র সম্পূর্ণতার ভাব। 'এ-মেয়ে যা'কে ভালোবাস্‌বে,' মনে-মনে তিনি বলেছেন, 'তা'কে ভাগ্যবান হ'লে চল্‌বে না, ভাগ্যকে তা'র তৈরি কর্‌তে হবে।'

'তুই যদি মনে-মনে কিছু ঠিক করে' থাকিস্—অন্তত, ভেবে থাকিস্', মুখে তিনি বল্‌লেন, 'সেটাই আমরা জান্‌তে চাই।'

'বিয়ে কি কর্‌তেই হবে—এখনই?'

'যদি কর্‌তেই হয়, এখনই কেন নয়?'

শ্রীলতা একটা চাম্‌চে দিয়ে পেয়ালার গায়ে মৃদু টোকা মার্‌তে লাগ্‌লো: কিছু বল্‌লে না।

'যদি ভুল বুঝে না থাকি,' একটু পরে কুমুদনাথ বল্‌লেন, 'তা হ'লে পার্থপ্রতিমকে একবার ডেকে পাঠাই। অনেকদিন সে আসে না।'

ঈষৎ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো শ্রীলতার গাল। মুখ নিচু করে' সে তাকিয়ে রইলো শূন্য পেয়ালার মধ্যে।

'পার্থপ্রতিম!' মানসী বলে' উঠ্‌লেন, 'ও তো শ্রীলতার জুতোর খরচই জোগাতে পার্‌বে না।' গাঢ়-তরো হ'লো শ্রীলতার মুখের রঙ্‌।

'সেটা,' কুমুদনাথ বল্‌লেন, 'খুব জরুরি কথা, কিন্তু আপাতত সেটা মুলতুবি থাকলেও ক্ষতি নেই।'

স্বামীর এই চটুলতায় মানসী বিস্মিত হ'লেন। চোখ ঝল্‌সে বল্‌লেন,'কিন্তু তুমি সত্যি-সত্যি ভাব্‌ছো না—'

'আমি তো মনে-মনে পার্থকেই ঠিক করে' রেখেছি। এখন শ্রীলতা বল্‌লেই—'

কুমুদনাম তাঁর কথা শেষ কর্‌তে পার্‌লেন না। মানসী তীব্রস্বরে বাধা দিলেন, 'এ যে স্রেফ পাগ্‌লামি! কোথাকার কে, সম্বল নেই এক পয়সার—না-হয় পরীক্ষা পাশ কর্‌তে ভালোই পারে—তা এমন তো কত ছেলেই আছে দেশে! দ্যাখো গিয়ে খোঁজ নিয়ে তা'রা কে কী কর্‌ছে।'

শ্রীলতা মৃদুস্বরে বল্‌লে—না বলে' পার্‌লে না, 'ও যদি কিছু না হয়, তা হ'লে কিছুই নয়; আর যদি কিছু হয়, তা'র কারণ এ নয় যে ও ভালো পরীক্ষা পাশ কর্‌তে পারে।'

‘ও যে-রকমের ছেলে’, কুমুদনাম বল্লেন, ‘কে ওকে আট্‌কে রাখ্‌বে। ও ঠেলে উঠ্‌বেই সব বাধা, জয়ী হবেই।’

‘তা হ’লে’, মানসী কথাটাকে প্র্যাক্‌টিক্‌ল্‌ স্তরে নামিয়ে আন্‌লেন, ‘ওকে বলো আই-সি-এস্‌ কি কিছু দিতে, তারপর যদি—’

‘বেশ বলেছো! ওকে কষ্ট করে’ আই-সি-এস্‌ দিতে হবে, ঢুকে পড়্‌তে হবে যেমন করে’ হোক্‌ সেই জ্যোতিশ্চক্রে, ঘুরে আস্‌তে হবে বিলেত, তারপর—তা র প র যদি—! কী দয়া! আর তখনও পার্থপ্রতিম সেই মানুষই, যা এখন সে আছে।’

‘মানুষ দেখে আবার বিয়ে হয় কবে!’

‘আমারও প্রায়ই মনে হয়েছে, মেয়েরা যেন খাঁচায় ভরা রঙ্‌চঙে পাখীর ঝাঁক—খাঁচার গায়ে বড়-বড় করে’ লেখা, FOR SALE। আস্‌ছে আই-সি-এস্‌, আই-পি-এস্‌-এর দল: বেছে-বেছে নিয়ে যাচ্ছে যা’র যেটিকে পছন্দ। এই তো হচ্ছে ম্যারেজ এ লা মোড।’

হঠাৎ রক্ত উঠে এলো মানসীর সুন্দর, মুখে। ঠোঁট কামড়ে তিনি বল্‌লেন, ‘মেনে নিলুম তোমার ঠাট্টা, কিন্তু—তুমি কী বলো? ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে গভীর প্রেম—না, কী?’

'ছেঁড়া কাঁথাই হ'তে হবে, তা'র মানে নেই। কিন্তু—তোমাদের যুগের বাঙালি মেয়েরা—কী তা'রা? জীবনের আদ্ধেক তা'রা কাটিয়ে দেবে মাঝে-মাঝে আয়নায় মুখ দেখে আর সময় পেলে একটু সেতার নিয়ে বসে': আর যেই আস্‌বে কোনো লোক, যা'র আছে আশানুরূপ পয়সা আর মান—নির্ব্বিবাদে ঢলে' পড়্‌বে তা'র কোলে—তা'র মোটারগাড়ির কোলে, বলা যায়। এদিকে সেই লোকটি—বাইরের দিক থেকে জীবনকে সে যেটুকু বাগে আন্‌তে পেরেছে, তা'র জন্য তা'কে হয়-তো সইতে হয়েছে কত ক্লান্তি, যেতে হয়েছে কত দুঃখের ভিতর দিয়ে, নিজকে পীড়ন কর্‌তে হয়েছে কত কঠিন পরিশ্রমে। সে-সময়ে তা'র দিকে কেউ ফিরেও তাকায় নি। তা'র স্ত্রী ছিলো না দুঃখের ভাগ নিতে, সে এলো মজা লোট্‌বার বেলায়। It isn't fair'.

'মনে-মনে রাগ থাক্‌লে', একটু চুপ করে' থেকে মানসী বল্‌লেন, 'এমন-কোনো জিনিস নেই, যা'কে বিকৃত করে' না দেখা যায়।'

'সে তুমি যেমন মনে করো', বলে' কুমুদনাথ একটা সিগ্রেট ধরালেন।

এর পর খানিকক্ষণ চুপচাপ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

কোথায় যেন একটু সূক্ষ্ম চিড় ধরে' গেলো : যেটুকু বলা হ'লো, তা'র আড়ালে ঝিলিক্ দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো অনেক অব্যক্ত। এ-অবস্থায় কিছু না বলাই সব চেয়ে ভালো। কুমুদনাথ তাঁর সিগ্রেটে একটা কিছু পেলেন কর্‌বার ; মানসী টেব্‌ল্‌-ক্লথের উপর নখের আঁচড় দিতে লাগ্‌লেন ; শ্রীলতার অস্বস্তি স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

এমন সময় মানসী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, 'যাই ; চায়ের টেবিলে সমস্ত সকাল বসে' থাক্‌লেই তো চল্‌বে না।'

'বেলা হ'য়ে যাচ্ছে আমারও। কিন্তু, শ্রীলতা, তোমার কথা তো শোনা হ'লো না।'

'আমাকে একটু ভাব্‌তে দাও, দাদা ; পরে জানাবো তোমাকে।'

সেদিনের সমস্তটা শ্রীলতা কাটালে তা'র ঘরের মধ্যে। চেষ্টা কর্‌লে ভাব্‌তে, পার্‌লে না। বস্‌লো বই নিয়ে, মন বস্‌লো না। তু' লাইন পড়া হ'তেই খেই যায় হারিয়ে ; সে তাকিয়ে থাকে বইয়ের পৃষ্ঠার দিকে, দেখ্‌তে পায় না কোনো অক্ষর। বিরক্ত হ'য়ে বই ফেলে' রেখে সে ঘুমোতে চাইলো ; ঘুম এলো না। চোখ বুজে সে চেষ্টা কর্‌লে কিছু না-ভাব্‌তে, একেবারে কিছু

না-ভাবাই তা'র মনে হ'লো সব চেয়ে ভালো। কিছু নয়: একটা ফাঁকা, ঘুম। কিন্তু অনেক দূরে ঘুম; অনেক, অনেক দূরে। চোখ বুজে থাক্‌তে তা'র যেন রীতিমত কষ্ট হ'তে লাগ্‌লো। চোখ মেলে' সে তাকিয়ে রইলো জান্‌লা দিয়ে আকাশে। দিন যেতে লাগ্‌লো কেটে। তারপর, সন্ধেবেলা, কুমুদনাথ যখন আপিস থেকে ফিরে বসেছেন দক্ষিণের বারান্দায় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস নিয়ে, শ্রীলতা গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালো।

'কী, লতা?' কুমুদনাথ বই থেকে চোখ তুল্‌লেন। শ্রীলতার চোখের পাতা কেমন-যেন ভারি হ'য়ে এলো। বিশেষ-কোনো উপলক্ষ্য ছাড়া কুমুদনাথ তা'কে লতা বলে' ডাকেন না।

'তোমার যা ইচ্ছে, দাদা, তুমি তা-ই করো,' শ্রীলতা বল্‌লে।

পরের দিন বিকেলের ডাকে পার্থপ্রতিম পেলো এই চিঠি, ইংরিজিতে লেখা, কুমুদনাথের কাছ থেকে:

'বল্‌লে অদ্ভুত শোনায়, যে-কথা আজ বল্‌তে হচ্ছে আমাকে; কিন্তু হয়-তো আপনি খুব অবাক হবেন না শুনে। কথাটা আমার বোন শ্রীলতার সম্পর্কে, যা'র সঙ্গে, যদি আপনার মনে-মনে কিছু ঠিক হ'য়ে

থাকে, সে তো ভালো কথা; আর যেটুকু হয় নি, তা ঠিক কর্‌বার ভার নিতে চাই আমরা। জান্‌তে পেরেছি শ্রীলতার মনের ঝোঁক, আর আপনি অবিশ্যি জানেন আপনার মন। এ-বিয়ে হবে সুখের, কেননা এ-বিয়ে হবে মুক্ত ইচ্ছার। তা ছাড়া আর-কিছু ভাব্‌বার নেই।

'আপনার উত্তরের অপেক্ষা কর্‌বো।'

পার্থপ্রতিম উত্তর লিখ্‌তে বস্‌লো তখনই :

'অবাক একটু হয়েছি বই কি। কখনো ভাব্‌তে পারি নি, এত বড় সম্মান আস্‌তে পারে আমার কাছে। এ আমার অতীত: আমার অনেক, অনেক উপরে। শুধু অবাক হ'তেই পার্‌ছি।

'গল্পে পড়েছি, রাজকুমারীর বিয়ে হ'লো রাস্তা থেকে ধরে'-আনা যে-কোনো লোকের সঙ্গে, তারপর—কোনো আশ্চর্য্য, অনির্দ্দিষ্ট উপায়ে, সেই লোকই উঠ্‌লো কীর্ত্তির চূড়ায়, দীপ্তির চরমে—যা'র সঙ্গে সংযোগে রাজকন্যাই ধন্য হলেন। কিন্তু হায়, এটা গল্প, রূপকথা।

'যদি জান্‌তেই চান, শ্রীলতার সঙ্গে আমার কখনোই মনে-মনে কিছু "ঠিক" হয় নি। আপনি যা বল্‌ছেন, আপনার চিঠি পড়ে'ই আমার প্রথম মনে হ'লো। যা অনুভব কর্‌ছি আমার উপর আপনাদের একান্ত দয়া,

অনেক ধন্যবাদ সে-জন্য। কিন্তু এত বড় ভার গ্রহণ করতে পারি, এমন সাধ্য আমার নেই। কেননা, কোনো মির‍্যাক্‌ল্‌ ঘটবে না—খামকা শুধু দিতে হবে দুঃখ আর নিতে হবে। বিয়ে ব্যাপারটা সমশ্রেণীর মধ্যে হ'লেই সুখের হ'তে পারে।

'শ্রীলতার কথা যা লিখেছেন, সেটা হয়-তো তা'র মুহূর্ত্তের আত্ম-বিস্মৃতি—নিশ্চয়ই তা-ই, আমার মনে হচ্ছে। তা'কে যেটুকু জানি, তা'র বুদ্ধি কখনো আত্ম-প্রতারণার সুযোগ দেবে না। কিন্তু সময়-সময় আমাদের তীক্ষ্ণতম বুদ্ধিকেও আল্‌গা করে' তুল্‌বে মোহ। সেটা ক্ষণিক।

'কোনো চিঠি লিখ্‌তে আমার কখনো এত কষ্ট হয় নি। বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌লুম না কিছুই; অনেক কথা লিখ্‌তে গিয়েও লিখ্‌তে পার্‌ছি নে—পাছে না জেনে ঘা দিয়ে ফেলি অন্য-কাউকে, পাছে নিজের উপর করে' ফেলি অবিচার। আপনারা বুঝ্‌তে পার্‌বেন নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়ে, এই আশা কর্‌ছি।

'যদি এর ফল এই হয় যে আপনারা মনে করেন আমি কপট আচরণ করলুম, কি যা আমার করা উচিত ছিলো, তা কর্‌লুম না—যদি, মোট কথা, এ-রকম সন্দেহ আপনাদের মনে ওঠে যে আমি "শেষ পর্য্যন্ত পিছিয়ে

গেলুম", সেটা আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমি জানি, ও-কথা সত্যি নয়: আমার নিজের মধ্যে কোনো সংশয় নেই, কোনো দুর্ব্বলতা।

'আর যদি এমন হয় যে শ্রীলতার সঙ্গে আমার পরিচয় শেষ কর্‌তে হবে এখানেই, মস্ত ক্ষতি মনে কর্‌বো সেটাকে। সব চেয়ে দুঃখ এই যে ব্যাপারটা এমন-কিছু নয় যা উপলক্ষ্য করে' তা'র বন্ধুতা হারাতে পারি। যা হ'লো, তা হ'বার কিছু দরকার ছিলো না।'

চিঠিখানা লিখে খামে ভরে' পার্থপ্রতিম তখনই বেরুলো রাস্তায়: নিজের হাতে ফেলে দিয়ে এলো ডাক-বাক্সে।

পরদিন, শ্রীলতার হাতে যখন পড়্‌লো সে-চিঠি সে পড়া শেষ করে' ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে বল্‌লে, উঠ্‌লো, 'সব রকম দেমাক সইতে পারি, দারিদ্র্যের দেমাক সইতে পারি নে।'

মা ও ছেলে—ও একটি কবিতা

সেই রাত্রে, খাওয়ার পরে, জঠরের মধ্যে সদ্যোমুক্ত জীর্ণকারী অ্যাসিডের প্রভাবে পার্থপ্রতিমের যখন ঈশ্বরের পৃথিবীকে মনে হচ্ছে সুন্দর আর জীবনকে নিঃশংয়ে

ভালো, সে বল্‌লে তা'র মাকে: 'আজ একটা চিঠি পেয়েছিলুম শ্রীলতার দাদার কাছ থেকে।'

হাতের মাসিকপত্র থেকে চোখ তুলে সোনার চশ্‌মার ফাঁক দিয়ে ইন্দিরা ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। একটু পরে বল্‌লেন: 'কী লিখেছেন?'

'লিখেছেন—মানে, ব্যাপারটা এই যে তাঁরা চান্‌ শ্রীলতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়।'

'তারপর?' বল্‌বার আগে ইন্দিরা খানিকক্ষণ চুপ করে' রইলেন।

'আমি লিখে দিয়েছি যে আমার তেমন অবস্থা নয়—'

'লিখে দি য়ে ছি স্‌?'

'হ্যাঁ। কেন—কী হয়েছে?'

মাসিকপত্র ইন্দিরার হাত থেকে কোলের উপর স্খলিত হ'য়ে পড়্‌লো।—'তুই অত তড়্‌বড়্‌ করে' লিখ্‌তে গেলি কেন? আমাকে একবার বল্‌তে হয় না?'

'আমি নিশ্চয় জান্‌তুম যে এ-বিয়ে তুমি পছন্দ কর্‌বে না।'

'তাই বলে' একটু ভেবে-চিন্তে দেখ্‌তে হয় না?'

'ভাব্‌বার আর কী আছে? এ তো স্পষ্ট যে এ অসম্ভব। ওঁরা নিজেরাও দু'দিন পরে মনে-মনে বল্‌বেন, "উঃ, খুব বেঁচে গিয়েছি"।'

'আমি যদি মেয়ের কেউ হতুম, তোর বোকামিতে আমার তাক লেগে যেতো।'

পার্থপ্রতিম মৃদু হেসে বল্‌লে, 'তুমি তো কোনো-কালেই আমার ভিতর বোকামি ছাড়া কিছু দেখ্‌তে পাও নি। আর সেটা ভালোই—কারণ, অবিশ্রান্ত বুদ্ধির চর্চ্চা করে'-করে' ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌তে হয়। এমন একটা জায়গা থাকা দরকার, যেখানে বোকা হ'তে পারা যায়।'

ইন্দিরা তাঁর চোখ থেকে চশ্‌মা খুলে টেবিলের উপর রাখ্‌লেন। আস্তে-আস্তে বল্‌লেন: 'আশ্চর্য্য! আমার কিন্তু বরাবর মনে হয়েছে যে শ্রীলতার সঙ্গে তোর বিয়ে হ'লে বেশ হয়।'

'শেষটায় তুমিও!' খানিকটা অতিরঞ্জিত স্বরে ও ভঙ্গীতে পার্থপ্রতিম কথাটা বল্‌লে।

'তোর কি কখনো মনে হয় নি ও-কথা?'

'যদি বলি, না, তুমি হয়-তো বিশ্বাস কর্‌বে না।'

'তুই কোনো-এক সময়ে বিয়ে কর্‌বি তো?'

'তা-ই তো ধরে' নিতে হয়—যদিও সম্প্রতি সে-জন্য কোনো তাগিদ অনুভব কর্‌ছি নে ভিতরে।'

'আর, শেষ পর্য্যন্ত, সেই যে-কোনো একজন মেয়েকেই তো কর্‌বি।'

'বিয়ে যদি কর্‌তেই হয়, যে-কোনো একজনকে

কর্‌বো না, বিশেষ-একজনকে কর্‌বো। একমাত্র একজনকে, বল্‌তে পারো।'

'শ্রীলতাকে কি তোর ভালো লাগে না?'

'ভালোর চাইতে অনেক বেশি লাগে।'

'তবে?'

'কী তবে? ভালো যা'কে লাগে, তা'কেই যদি বিয়ে কর্‌তে হয়, তা হ'লে তো বহুবিবাহেও কুলোয় না।'

'তুই ঠিক জানিস্‌ যে মনকে তুই চোখ ঠার্‌ছিস নে?'

'তা পার্‌ছি নে বলে'ই তো যা কর্‌ছি, তা কর্‌তে হচ্ছে।'

'তোর কথার মানে বোঝা যায় না। শ্রীলতাকে তোর ভালো লাগে, সে ই জ ন্য ই তুই তা'কে বিয়ে কর্‌বি নে।'

'সে-কথা নয়, মা। যদিও সে-ও একরকমের কথা আছে। কবিতায় তা খুব ভালো শোনায়। শেলিয়ান-প্লেটোনিক গোছের মনের ভার। সিউডো-শেলিয়ান-প্লেটোনিক। নেহাৎ ফাঁকা কথা: যা'রা ও-সব বলে, আসলে শরীর ব্যাপারটাকে তা'রা একেবারেই সইতে পারে না। একরকমের পার্ভর্শন।'

কথাগুলো বলে' পার্থপ্রতিম কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালো মা-র মুখের দিকে, কী-রকম ফল হয়েছে

তা'দের, তা লক্ষ্য কর্‌বার জন্য। এটা তা'র একটা প্রিয় দুষ্টুমি, ইন্দিরার সঙ্গে কথা বল্‌তে-বল্‌তে হঠাৎ তাঁর মাথার অনেক উপর দিয়ে বোঁ করে' একটা তীর চালিয়ে দেয়া—তাঁকে স্তম্ভিত করে' দেবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু এতে অভ্যস্ত, ইন্দিরা কোনো আমলেই আন্‌তেন না এ-সব কথাকে।

'বাজে কথা রাখ্', ইন্দিরা বল্‌লেন, 'তোর মনের কথাটা কী, শুনি?'

'মনের কথা বলা বড় শক্ত, মা। কুমুদবাবুকে খানিকটা লেখ্‌বার চেষ্টা করে'ই বুঝেছি।'

পার্থপ্রতিমের কথার সুরে মনে হয়, সে যেন ফাজ্‌লেমি কর্‌ছে। ইন্দিরা বিস্মিত হ'লেন, একটু আহত হ'লেন। কিন্তু এই ওর ধরণ; সব-কিছু নিয়েই ওর খেলা। ও শেখে নি গম্ভীর হ'তে: যে-সমস্যা কঠিন, যা'তে অনেক ভাবনা, অনেক বিতর্কের অবকাশ—তা'র উপর দিয়ে ওর মন চলে' যায় হাস্‌তে-হাস্‌তে, অবাধে, যেন কিছুই ব্যাপার নয়। আর হয়-তো, ইন্দিরা এক ফাঁকে ভাব্‌লেন, সেটা একরকমের মন্দ উপায় নয় সমস্যা-সমাধানের—ভাবনার দেয়ালে কপাল ঠুকে মরে' গেলেও যখন আমরা অনেক সময়ই কিছু কর্‌তে পারি নে।

'তোর যা ইচ্ছে, তা-ই তো করেছিস্', আলাপটাকে শেষ করে' আন্‌বার ধরণে ইন্দিরা বল্‌লেন, 'কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিলো—'

'তোমার ইচ্ছে!' পার্থপ্রতিম বলে' উঠ্‌লো, 'তোমার তো কতই ইচ্ছে হয়। উঃ, তোমরা মেয়েরা! বাজারে গিয়ে যে-কোনো সুন্দর জিনিস ত্থাখো, তা-ই তো কিন্‌তে ইচ্ছে করে।'

'আমার এ্-ইচ্ছেটা যে আজগুবি ছিলো না, তা তো প্রমাণই হ'লো।'

'কিন্তু, মা, তুমি কি জানো না, আমাদের চাইতে ওরা কত উঁচুতে? অনেক ওদের পয়সা, মস্ত ওদের মান। তোমার এ-বাড়িতে শ্রীলতাকে ধর্‌তো কোথায়?'

'কী এসে যায় তা'তে? ভালোবাসাতে সব মানিয়ে যায়।'

'—যদি ভালোবাসা হয়। তা'র সুযোগ দাও আগে। কিন্তু এখন—আমি যদি শ্রীলতাকে বিয়ে করি, কী হবে? হঠাৎ একলাফে আমি উঠে যাবো উচ্চ-সমাজে, রাতারাতি গজিয়ে-ওঠা ব্যাঙের ছাতার মত ঐশ্বর্য্যের চাঁদোয়া আমার মাথার উপর। সেটা আমি কী করে' সহ্য কর্‌বো? নিজকে এমন প্রকাণ্ড ফাঁকি মানুষ দিতে পারে! আমাকে যদি বড় হ'তেই হয়,

হ'তে হবে নিজেরই জোরে: যদি উঠ্‌তেই হয় উপরে, ঠেলে-ঠুলে একটু-একটু করে' উঠ্‌বো কঠিন চেষ্টায়; প্রতি পদে টের পাবো—এবং অন্যকে পাওয়াবো—যে কিছু হচ্ছে। সেটাই সুখ। ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ আমার পছন্দ হয় না—আর, তুমি যা-ই বলো, মা—তা হয়ও না। গিয়ে দেখ্‌বো, সেটা ভুল স্বর্গ।'

'কিন্তু এটা যে মস্ত সুযোগ ছিলো তোর পক্ষে। এমন আর না-ও আস্‌তে পারে।'

'যেতে দাও, মা! সব ব্যাপারেই তো আমাদের ব্যবসাদারি কর্‌তে হয় আজকালকার দিনে; বিয়েটা অন্তত থাক্‌।'

'ও-রকম করে' দেখ্‌বার দরকার কী? ঠেলে-ঠেলে উঠ্‌তে যখন তোর খুব অসুবিধে হচ্ছে, প্রায় পড়ে' যাচ্ছিস্‌, তখন যদি কেউ হাত বাড়ায় তোর দিকে, তুই কি তা ফিরিয়ে দিবি? পৃথিবীতে বাঁচ্‌তে হ'লে আমাদের কা'র না সাহায্য নিতে হয় অন্যের? যে বলে, অন্য-কাউকে আমি চাই নে, সে মিথ্যে জাঁক করে।'

'সাহায্য তাদের কাছ্‌ থেকেই নেয়া যায়, মা, যাদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক। সেখানে আমি চেয়ে নেবো—যদি আমার দরকার হয়। কিন্তু এখানে—আমার

টাকা নেই, তাঁদের আছে। তাঁরা চাচ্ছেন আমাকে কিনে নিতে। মনে কোরো না, তাঁরা মনে-মনে কী বল্‌ছেন, আমি বুঝি নে। তাঁরা বল্‌ছেন: "আহা—ছেলেটার ভিতরে জিনিস ছিলো, কিন্তু বাইরের কোনো সুযোগ নেই। ওকে আমরা মানুষ কর্‌বো, তৈরি কর্‌বো। ও হবে আমাদের গৌরবের জিনিস।" অন্যের গৌরবের উপলক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হ'বার সখ আমার নেই।'

'মনে কর্ না কেন যে এটা তোর কৃতিত্বের পুরস্কার। কত ছেলেই তো আছে—আর-কাউকে তো তা'রা চাইলো না।'

'অবাক হচ্ছি তা'তেই। আর পুরস্কার—এমন-কোনো কীর্ত্তি আমার নয়—যে-জন্য স্বয়ং রাজকন্যা ফুলের মালা হ'য়ে লুটিয়ে পড়্‌তে পারে আমার গলায়।—অর্দ্ধেক রাজত্বের কথা না-ই বল্‌লাম।' একটু শুষ্ক হেসে পার্থপ্রতিম জুড়ে দিলে। 'যেটা পুরস্কার', হঠাৎ যেন একটা নতুন কথা মনে হয়েছে, এইভাবে সে আবার বল্‌লে, 'অনেক কষ্টে তা'কে অর্জ্জন কর্‌তে হয়। তা সহজ নয়। সহজে যা আসে, তা আমি চাই নে।'

'যেমন তুই বুঝিস্', ইন্দিরা সংক্ষেপে বল্‌লেন।

'রাগ কর্‌লে নাকি?' পার্থপ্রতিমের মুখ হাসিতে

উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো, 'কিন্তু বোঝো না কেন—আমি যদি শ্রীলতাকে বিয়ে করি, এ-সন্দেহ আমি কিছুতেই এড়াতে পার্‌বো না যে আমি তা করেছি ওর টাকার লোভে, ওর সঙ্গে জড়িয়ে অনেক যে-সব সাংসারিক সুবিধে আস্‌বে আমার কাছে, তা'র লোভে। মনে-মনে যদি জানিও যে তা সত্যি নয়; তবু সঙ্কোচ থেকেই যাবে, নিজকে ঠিক বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বো না। সে-অবস্থাটা সুখের নয়।'

'শ্রীলতার যে কিছু টাকা আছে, সেটা ওর অপরাধ নয়।'

'কিন্তু, উপস্থিত, তা'র টাকা থেকে তা'কে আলাদা করে' দেখা যাচ্ছে না যে। আর, বিয়ে কর্‌তে হ'লে তা স্ত্রীর জন্যেই করা ভালো—কী বলো?'

ইন্দিরা বল্‌তে যাচ্ছিলেন, 'এ-বিষয়ে শ্রীলতার হয়-তো কিছু বল্‌বার থাক্‌তে পারে। তা'র কথা তুই একেবারেই ভাব্‌ছিস নে।' কিন্তু তিনি তা না-বলাই ভালো মনে কর্‌লেন। থাক্‌, আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। এ-রকম ক্ষেত্রে সব চেয়ে দুর্ব্বল হচ্ছে দুঃখের দোহাই পাড়া। যে-মন সব সময় সোজাসুজি চল্‌তে চায়, সেটা হয় তা'র উপর অন্যায় সুবিধে নেয়া। যে-মন সব সময় নিজের প্রতি খাঁটি, তা'র কাছে যদি কোনো জিনিস

কর্ত্তব্যচ্যুতি হিসেবে ধরা হয়, খামকা কষ্ট দেয়া হবে তা'কে। কর্ত্তব্য বলে' তো সত্যি কিছু নেই; আছে শুধু আমাদের ইচ্ছা।

ইন্দিরা শুতে গেলেন: পার্থপ্রতিম তা'র চেয়ারে চুপচাপ বসে' ভাব্‌তে লাগ্‌লো। না—ঠিক ভাব্‌তে লাগ্‌লো নয়—তা'র মন যেন নির্লিপ্ত, শূন্য আকাশ, যা'র উপর দিয়ে অলস, শাদা মেঘের মত ভেসে যাচ্ছে ভাবনাগুলো। রাত বেশি হয় নি: রাস্তার ওপারে পানের দোকানে চল্‌ছে উড়েদের হল্লা—সঙ্গীতপ্রিয় বটে এই উড়ে জাত! এরা দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে গান গাইবে—মানে গান সম্বন্ধে তাদের যা ধারণা—অন্ধকারে গান গাইবে, বৃষ্টিতে গান গাইবে, আর চাঁদের আলো হয়েছে কি কথা নেই, একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌বে এরা। চাঁদের আলো সম্বন্ধে এদের বড় সহজ প্রতিক্রিয়া। কথাটা ভেবে নিজের মনে পার্থপ্রতিম একটু হেসে উঠ্‌লো।

উড়েদের গান শুন্‌লে আমার খুন কর্‌তে ইচ্ছে করে, পার্থপ্রতিম ভাব্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই আনন্দ পায় তা'তে, না হ'লে তা'র পিছনে এতটা শক্তি ওরা খরচ কর্‌তে যাবে কেন? আর, ওরা যদি আনন্দই পায়, তা হ'লে আমার আপত্তির, আমার অবজ্ঞার কী

মূল্য ? আমার কথা ওরা ভাব্‌তে যাবে কেন, ঐ যে লোকটি থাকে উল্টো দিকের ঘরে, তা'র বুঝি কাজের ব্যাঘাত হ'লো কি ঘুমের। আমি বল্‌বো, আমি অনেক উঁচুদরের লোক, আমার তুলনায় মানুষই নয় ওরা— আমার সময়ের, সুখ-সুবিধের মূল্য বিস্তর, যা'র কাছে উড়ে প্রভৃতি ছোট জাত তাঁবেদারি কর্‌তে বাধ্য। কিন্তু তা-ই কি ? কে জানে ? কোনোখানে, কারো কাছে, হয়-তো এই বর্ব্বর, নিছক প্রবৃত্তিচালিত, কাম-তাড়িত উড়েতে আর শিক্ষিত, সূক্ষ্মমনা, অতি-সভ্য, নাগরিক আমাতে কোনো প্রভেদ নেই। এই উড়ের কি জীবনের উপর ঠিক ততটা দখল নেই, যতটা আছে আমার, শিশির ভাদুড়ীর, সাহানা দেবীর কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ? ও যখন গান করে চাঁদের আলোয়, তখন তো ব্যক্ত করে জীবনের উপর সেই আদিম প্রবল অধিকারকে—আমি ওকে তেড়ে মার্‌তে আস্‌বার কে ? আসল কথা আমি ওকে দেখেছি বড় দূর থেকে, একেবারে বাইরে থেকে—আমার পক্ষে ওর অস্তিত্বই নেই। সত্যি বল্‌তে, ওকে আমি কখনো দেখিই নি। যদি কখনো দেখ্‌তুম, তা হ'লে ওর একটা রূপ ধরা পড়্‌তো আমার চোখে, যা বিশেষ, যা অর্থময়। যদি কখনো মুহূর্ত্তের জন্যও প্রবেশ কর্‌তে পার্‌তুম ওর

ভিতরে, তা হ'লে কিছুতেই পার্তুম না ওকে কেবলই দূরে ঠেলে রাখ্তে, স্বীকার করে' নিতে হ'তো ওকে বিশ্বের মধ্যে একটা প্রাণের স্পন্দন বলে'। তা হ'লে ওর গান—ভালো না লাগুক্, বুঝ্তুম তা'র সার্থকতা। কিন্তু তা'র বাধা কত—সমাজের, অভ্যাসের, আমাদের প্রাত্যহিকতার খোপ-কাটা সঙ্কীর্ণতার। এখানে আমি বসে' আছি আমার বুদ্ধির, আমার শিক্ষার বড়াই নিয়ে—কিন্তু একজন শাদা চাম্ড়ার লোকের কাছে আমি অর্থহীন, বড় জোর তা'র হাসি পায় আমার সভ্যতার চেষ্টা দেখে। আমার পক্ষে, তেম্নি, একজন চীনেতে কী এসে যায়? আমি শুধু হাততালি দিয়েছি তা'র অদ্ভুত শারীরিক কস্‌রৎ দেখে—তা'র বেশি আর কী? আমার তো হাসি পায় অস্ট্রেলিয়ানদের কথা ভাব্লে—মনে করি, ওরা শুধু ভেড়ার চাষ কর্লো আর খেল্লো ক্রিকেট, জীবনের ওরা কী জান্লো, জীবনের মূল রসস্রোত থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন। এদিকে কোনো অস্ট্রেলিয়ান যদি বাঙ্লাদেশের নাম শুনে থাকে তা-ই যথেষ্ট। পৃথিবীতে কত দূর, অখ্যাত সব দেশ রয়েছে, প্যাসিফিকের দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকার কোণ-ঘুপ্চি, মধ্য-আফ্রিকার অরণ্যময় বিস্তৃতি—অবাক লাগে ভাব্তে, সেখানেও মানুষ আছে, কী করুণা হয় তাদের জন্য,

আহা-বেচারা বলে' কত তাদের পিঠ-অপড়াই! কোনো কীর্ত্তি নেই তাদের, কোনো সৃষ্টি নেই, যা দিয়ে দূর দেশের লোক তাদের মনের স্পর্শ পেতে পারে; যৌন-মনস্তত্ত্বের বইয়ের নানারকম উদ্ভট উদাহরণ মানব-সভ্যতায় তাদের একমাত্র দান। কিন্তু তা'রা হয়-তো বেশ সুখেই আছে—যে-শাদা মানুষ তাদের ঘরের পাশ দিয়ে নিত্য যাতায়াত করে কলম আর ক্যামেরা নিয়ে, তা'কে তা'রা হয়-তো একটুও ঈর্ষা করে না—বরং মনে-মনে একটু করুণাই করে। তা'রা হয়-তো নিজেদেরকে জানে খোদ ঈশ্বরের কাছ থেকে পরোয়ানা নিয়ে এসেছে পৃথিবীকে ভোগ কর্‌বার। তাদের আছে নিজেদের জীবন—তা'র নৃত্যের উৎসব, বসন্ত-আমন্ত্রণের গাম্ভীর্য্য, তা'র পার্ব্বণের প্রাণ-লীলা, রীতির কাঠিন্য। কোনো প্রত্যক্ষ আর্টের ভিতর দিয়ে তা'রা দিতে পারে না নিজেদের; তা'দের মন্থর, সুসমঞ্জস জীবনই হয়-তো একটা আর্ট। এমনও হ'তে পারে, আমার চাইতে তা'রা কম বাঁচ্‌লে না এতটুকু। এত বৈপরীত্য, এত বিরোধ, বৈচিত্র্য, অথচ একই পৃথিবী, একই জীবন। জীবন—জীবন কী? কিন্তু কেন তা ভাব্‌তে যাওয়া? বাঁচাই তো যথেষ্ট শক্ত কাজ, তা নিয়ে ভাব্‌তে গিয়ে কেন তা'কে জটিলতরো করে' তোলা? ছেড়ে দাও—

জীবনকে নাও যেমন আসে, দু'হাতের অঞ্জলি ভরে' নাও, প্রাণ ভরে' নাও।

পার্থপ্রতিমের একটুও ঘুম আস্‌ছিলো না। দেরি করে' শোয়া তা'র অভ্যেস, কিন্তু আজ সে ঘুমোতে পেলে খুসি হ'তো—যদি ঘুম আস্‌তো। সে ভেবে পাচ্ছিলো না, এখন কী করে। মন যাচ্ছে না কোনো কাজে—অথচ এত সময় হাতে। চেয়ার থেকে উঠে সে একটু পায়চারি কর্‌লে, একটু দাঁড়ালে জান্‌লার ধারে। চাঁদ উঠ্‌বে কখন? কাল রাত বারোটার সময় আধখানা পাংশু চাঁদ দেখা দিয়েছিলো আকাশে, তা'র সে-দীপ্তি নেই, দেখে মনে হয় যেন অসুখ করেছে—তবু সে চাঁদ। আজ আরো দেরি হবে। প্রতি রাত্রে শুতে যাবার আগে চাঁদের দেখা পেতে পার্থপ্রতিম ভালোবাসে কৃষ্ণপক্ষে যত দেরি হ'তে থাকে চাঁদ উঠ্‌তে, সেই অনুসারে যদি ঘুমোবার সময়ও পেছিয়ে দেয়া যেতো! কিন্তু তা হয় না, শেষ পর্য্যন্ত পেছিয়ে পড়্‌তেই হয় পাল্লায়। অনেক চাঁদহীন রাত্রি জীবনে, অনেক অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারই কি কম সুন্দর! তারায়-তারায় উঠে গেছে রাত্রির অন্ধকার স্তম্ভ—কোন্ অদৃশ্যে, কোন্ সময়-হীনতায়। পার্থপ্রতিম জান্‌লা দিয়ে একবার রাস্তার দিকে তাকালো। উল্টো দিকের ফুটপাথে শুয়ে আছে

কতগুলো লোক—তাল-পাকানো মংসপিণ্ড, পার্থপ্রতিম ভাব্‌লে, কাঁচা, খোলস-ছাড়ানো মানবতার স্তূপ। একজন নিঃসঙ্গ উড়ে ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে জের টেনে চলেছে গানের, যেন নিজের সঙ্গে বাজি রেখে। তা ছাড়া শান্ত রাস্তা: যতদূর সে দেখ্‌তে পেলো, একটি লোক নেই। ম্লান-সবুজ গ্যাসের আলোয় যেন বিছিয়ে রয়েছে ধূসর ক্লান্তি।

In your arms were still delight
Quiet as a street of night—

পার্থপ্রতিম মৃদুস্বরে আবৃত্তি কর্‌লো। বেশি রাত্রে শহরের কোনো রাস্তার দিকে তাকালেই তা'র মনে পড়ে ও-দুটি লাইন। ও-কবিতা যদি লেখা না হ'তো, তা হ'লে সে কখনো জান্‌তো না, কী সুন্দর এই রাত্রির রাস্তা, কী আশ্চর্য্য তা'র শান্তি। ও-কবিতা ভালোবাসে ব'লে'ই, বোধ হয়, সে ভালোবাসে রাত্রির রাস্তা। যে-কোনো সময়ে, যখনই একটু বেশি রাত্রে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, রাস্তায় পা দিয়েই তা'র মনে পড়েছে :

In your arms were still delight
Quiet as a street of night.

তা'র মাথার মধ্যে ছন্দের বাজনা—কত তা'র প্রতিধ্বনি, কী সূক্ষ্ম তা'র অনুরণন। কতবার বলেছে মনে-মনে,

তবু যেন পার পায় নি ঐ একটি বিক্ষিপ্ত শ্লোকের। কে বলে জাদু নেই—এর চেয়ে আশ্চর্য্য জাদু আর কী হ'তে পারে—এই ছন্দের, এই কথার? কথার শক্তি অসীম। অনির্ব্বচনীয় তা'র রহস্য, তৌল করা যায় না তা'র মহিমাকে। কেননা, কথা নিজকে ছাড়িয়ে যায় সঙ্গীতে, ধ্বনিতে হ'য়ে ওঠে ইঙ্গিতময়। তা'রই নাম মন্ত্র।

পার্থপ্রতিমের ভাবনার খেই হারিয়ে যাচ্ছিলো। তা'র মন যেন এলোমেলো হ'য়ে পড়েছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে অপ্রাসঙ্গিক থেকে অপ্রাসঙ্গিকে। এতক্ষণ সে যা-কিছু ভেবেছে, তা'র আড়ালে কী যেন এক অস্ফুট কথার গুন্‌গুনানি—যা সে চাপা দিয়ে রাখ্‌তে চাইছে, হয়-তো নিজেরই অজ্ঞাতে, অবান্তর ভাবনার পর্দ্দা দিয়ে। সে চায় না, ও-সব ভাব্‌তে সে চায় না। ও-সব পড়ে' থাক্ মনের তলায়, সেখানে তা'রা কারো কোনো ক্ষতি কর্‌তে পারে না। কিন্তু যতক্ষণ তা'র উপরকার মন ব্যাপৃত ছিলো নিজকে-দেখানো গোছের ভাবনা নিয়ে, তা'র চেতনার গভীরতায় যেন চলেছে অন্য-কোনো ভাবনা, তা'র সচেতন মনের সাহায্য না নিয়েই। যেমন অর্কেস্‌ট্রার উত্তাল সঙ্গীত-তরঙ্গের আড়ালে সারাক্ষণ বয়ে' চলে কোনো সূক্ষ্ম, একটানা সুর—সযত্নে কান

পেতে না থাক্‌লে যা শোনা যায় না। যা ছিলো অস্পষ্ট, তা যেন নিজেরই মধ্যে আলোড়িত হ'য়ে নির্দ্দিষ্ট রূপ নিয়ে উঠ্‌ছে। আসল যে-কথাটা পার্থপ্রতিম হাত্‌ড়ে ফিরেছে না জেনে, তা যেন ধরা পড়্‌ছে ছন্দে। হঠাৎ তা'র একটা কবিতার লাইন মনে পড়্‌লো। পেয়েছে, এতক্ষণে সে পেয়েছে। কথা পাওয়া গেছে; তাই সে বুঝ্‌তে পার্‌ছে তা'র মনের ভাব। এই কথাই তো সে বল্‌তে চেয়েছে তা'র নিজের কাছে, মা-র কাছে—আজ কতক্ষণ ধরে'। আশ্চর্য্য—আগে তা'র কেন মনে হয় নি? আস্তে-আস্তে সে ফিরে গেলো তা'র চেয়ারে, বস্‌লো কাগজ-কলম নিয়ে। খানিকক্ষণ পরে তৈরি হ'লো এই কবিতা:

যাহারে স্মরণ করি' সিন্দুর দিতেছো শুভ্রভালে,
হে সুন্দরী, সে কি তব হৃদয়ের সীমাপ্রান্ত-'পরে
নামে বর্ষণের মত? উচ্ছলিত লীলাভঙ্গী-ভরে
তরঙ্গ তুলিয়া যায় খরস্রোতে, তীব্রদ্রুততালে?
তুমি কি দেখেছো তা'রে অন্তরের স্তব্ধ রাত্রিকালে
বিশ্বের রহস্য-তল উন্মীলিত প্রহরে-প্রহরে?
চরম মিলন-লগ্নে নিবিড়-নিমগ্ন পরস্পরে—
কী দুর্লভ আবিষ্কার তবু যেন্‌ রয়েছে আড়ালে!

অথবা লভেছো তা'রে বিধানের অন্ধ মূঢ়তায়,
বাসনা-উত্তাপ-হীন, নিশ্চেতন, সঙ্কীর্ণ সঙ্গমে ?
অনায়াস যুগ্মযাত্রা চিন্তাহীন অভ্যাসে মসৃণ ?
অথবা কি পরস্পরে কামনার উন্মত্ত বিভ্রমে
মুহূর্তে নিঃশেষ করি, হারায়ে ফেলেছো, উদাসীন,
প্রাত্যহিক তুচ্ছতায়, তন্দ্রাবিজড়িত জড়তায় ?

কবিতাটা একটা কাগজে টুকে তা'র নিচে পার্থপ্রতিম লিখ্‌লে দু'লাইন :

'অনেকদিন আগে আপনি একবার আমার কবিতা পড়্‌তে চেয়েছিলেন। তখন পাঠাতে পারি নি; এখন পাঠালুম আপনাকে আমার এই কবিতা—আপনারই জন্যে লেখা।'

তারপর কাগজটা খামে ভরে' তা'র উপরে লিখ্‌লে শ্রীলতার নাম আর ঠিকানা। পরের দিনের ডাকে সেটা গেলো, পার্থপ্রতিমের মনে আশা ছিলো, শ্রীলতা কিছু লিখ্‌বে উত্তরে। পরের দিন গেলো, চিঠি এলো না। দু' তিন, তিন দিন কাট্‌লো; কোনো সাড়া নেই। তখন পার্থপ্রতিম বুঝ্‌লো যে যা ছিলো, তা ছিলো। এখন আর নেই।

মানসীর মান

অনেক রাত। পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার ছড়িয়ে আছে শ্রীলতাদের বাগানে। হাওয়াটা শির্‌শিরে; গায়ে লাগ্‌লে একটু শীত-শীত করে। চারদিকে স্তব্ধতা। আকাশ ছেঁড়া মেঘে এলোমেলো; তা'রই ফাঁক দিয়ে কয়েকটা তারা আছে চুপচাপ তাকিয়ে। এইমাত্র উঠ্‌লো কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা তামাটে চাঁদ—যেন ঘোর অনিচ্ছায়, নিতান্ত দায়ে ঠেকে। সে মর্‌তে বসেছে; তা'র যেটুকু আলো, তা'তে নিজকেই প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছে অতি কষ্টে। যেন তা'কে খাতির করে' অন্ধকার একটু আবছায়া হ'য়ে এলো।

সেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে শ্রীলতা দাঁড়িয়ে তা'র ঘরের সাম্‌নেকার বারান্দায়, রেলিঙে ভর্‌ দিয়ে। শেমিজের উপর শাদা শাড়ির আঁচল তা'র গায়ে জড়ানো। চুল জড়ানো কোনোরকমে একটা খোঁপা করে'। চাঁদের প্রেত-আলো পড়েছে তা'র মুখে। তা'তে তা দেখাচ্ছে আরো বেশি শাদা।

মনে হ'তে পার্‌তো, চাঁদের মধ্যে শ্রীলতা বিশেষ কৌতূহলের কিছু দেখ্‌ছিলো, এমন নির্নিমেষ তা'র দৃষ্টি। কিন্তু সে-দৃষ্টিতে শূন্যতা, যেন সাম্‌নে কিছু-একটা আছে বলে'ই সে তাকিয়ে আছে। তা'র ঠোঁট চাপা, তা'র মুখের ভাব একটু শক্ত—ক্লান্ত, মুমূর্ষু চাঁদ যা আরো বেশি ফুটিয়ে তুল্‌ছিলো। হাওয়ায় চুল এসে উড়ে পড়্‌ছে তা'র কপালে, কিন্তু তা সরাবার জন্য সে একবারও হাত তুল্‌ছে না।

শ্রীলতা যদি জান্‌তো, এ-সময়ে কেউ তা'কে লক্ষ্য কর্‌ছে, তা হ'লে সে নিশ্চয়ই একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতো কি অস্ফুট স্বরে আউড়ে যেতো একটা সুরের টুক্‌রো কি—যা হোক্‌ কিছু কর্‌তো, দাঁড়িয়ে থাক্‌তো না অমন স্তব্ধ হ'য়ে। কিন্তু সে নিজেই যেন হারিয়ে গেছে এই রাত্রির নীরবতায় আর আবছায়ায়—কী করে' সে দেখ্‌তে পারে পিছনে তাকিয়ে? আর যদি বা দেখ্‌তো, তা হ'লেও হয়-তো তা'র কিছু চোখে পড়্‌তো না। কারণ বারান্দা ছায়াময়, আর যে-চোখ একটু দূর থেকে, পাশের ঘরের দরজার আড়াল থেকে তা'কে লক্ষ্য কর্‌ছে, তা গভীর কালো। কালো আর উজ্জ্বল। সে-চোখে কৌতুকের ছটা, বিদ্রূপের ক্ষীণতম আভাস। আর, সে-চোখ যে-মাথায় বসানো, সাপের তুলে-

ধরা ফণার মত তা গর্ব্বিত ও উদ্ধত। আর তেমনি সুন্দর।

মানসীর পরিপূর্ণ যৌবন যেন তাঁর শরীরের প্রতি বাঁকা রেখায় কথা কয়ে' উঠ্‌ছে। তাঁর রঙ্‌ কালো, কিন্তু লাবণ্য উপ্‌চে পড়্‌ছে তাঁর সর্ব্বাঙ্গে। খামকা নয়, কুমুদনাথ যে তাঁর জন্য অত দুঃখভোগ কর্‌তে রাজি হয়েছিলেন। আর মানসী জান্‌তেন তাঁর নিজের আকর্ষণ; জান্‌তেন তাঁর যৌবনের গৌরব। তিনি সেই ধরণের আমাদের দেশে বিরল মেয়ে, যাঁরা জীবন আরম্ভ করেন একটা বাঁধা উদ্দেশ্য নিয়ে, এবং তা'র সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হন্‌ই, যেমন করে'ই হোক্‌। মানসীর শরীর যেমন দৃঢ়, তাঁর সঙ্কল্প তেম্‌নি কঠিন। স্বপ্ন নিয়ে তিনি কখনো বিলাস করেন নি: অস্পষ্ট ইচ্ছা, মনের মধ্যে রহস্যের স্বর—ও-সব তিনি বুঝ্‌তেন না। ছেলেবেলা থেকে তিনি জান্‌তেন—এবং চাইতেন—যে তাঁর স্বামী হবে মস্ত লোক; পারিপার্শ্বিক দীপ্তির মধ্যে দীপ্তিময়ী, তিনি রাজত্ব কর্‌বেন। তাঁর সে-সাধনা থেকে তিনি ভ্রষ্ট হন্‌ নি একদিনের জন্যেও। আর তা-ই হ'লো— যতটা আশা করা গিয়েছিলো, ততটা হয়-তো নয়; কিন্তু এ-ও মন্দ নয়, মন্দ নয়। এবং আরো আছে: এখনো পড়ে' আছে অনেক ভবিষ্যৎ। লোকে যা'কে

ভালোবাসা বলে, তাঁর পক্ষে তা'র কোনো অর্থ ছিলো না। তিনি কি তাঁর স্বামীকে ভালোবাস্‌তেন? হ্যাঁ, যেমন, আশা করা যায়, একজন তা'র স্বামীকে ভালো-বাস্‌বে। কিন্তু তা নিয়ে হৈ-চৈ কর্‌বার মত তিনি কিছু দেখ্‌তেন না; সেটা এমন জিনিস নয়, তাঁর মনে হ'তো, যা'তে ভয়ানক কিছু এসে যায়। ভালোবাসা তো হবেই—সেটা জানা কথা। যা না-ও হ'তে পারে, এবং যা হওয়াই সব চেয়ে দরকারি, তা হচ্ছে—বাদ-বাকি যা-কিছু। ভাবনা তা'র জন্মেই।

দরজার ধার থেকে মানসী সরে' এলেন। তাঁর আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছিলো মেঝেতে; সেটা কুড়িয়ে তুলে নিলেন বুকের উপর। তাঁর খোলা চুল পিঠের উপর ছড়ানো—একরাশ কালো আগুনের মত, সে-সময়ে তাঁকে লক্ষ্য কর্‌বার কেউ থাক্‌লে তা'র মনে হ'তে পার্‌তো, পরস্পরের সঙ্গে বিজড়িত অগুন্‌তি কোঁক্‌ড়ানো, দীর্ঘ শিখার মত। আগুনের মত দীপ্তি সে-চুলের, আগুনের মত তা দৃপ্ত ভঙ্গীতে বিসর্পিত। বারান্দার ম্লান অন্ধকারে মানসী আস্তে-আস্তে শ্রীলতার দিকে এগোতে লাগ্‌লেন। নিঃশব্দে। শাড়ির তলা থেকে তাঁর ছোট ছুটি পা যেন কোনো কৌতূহলী, অন্ধকারের জীবের মত উঁকি মেরে-মেরে যাচ্ছে।

শ্রীলতার ঠিক পিছনে এসে তিনি থাম্‌লেন; মৃদুভাবে এক হাত রাখ্‌লেন তা'র কাঁধের উপর।

শ্রীলতা এমন প্রবলভাবে চম্‌কে উঠ্‌লো যে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য তা'র নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেলো। সে ফিরে তাকালো, কিন্তু তা'র নিঃশ্বাসের দ্রুতগতি গোপন কর্‌বার জন্য একটু সময় কোনো কথা বল্‌লে না। তারপর, যখন সে বুঝ্‌তে পার্‌লো তা'র নিঃশ্বাস আবার স্বাভাবিক হ'য়ে বইছে, 'এত রাত্রে তুমি এখানে!' সে বল্‌লে। তা'র হাস্‌বার চেষ্টা ঠিক সফল হ'লো না।

'আমিও তোমাকে সে-কথাই জিজ্ঞেস কর্‌তে যাচ্ছিলুম।'

'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো—বড় গরম—এসে একটু দাঁড়ালুম এখানে।—তুমি কেন উঠে এসেছো?' শেষের প্রশ্নটায় একটু তীব্রতা ছিলো। বৌদির মনের ধরণ শ্রীলতা জান্‌তো; যেখানেই তাঁর নিজের সঙ্গে মেলে না, সেখানে তিনি তামাসা কর্‌তে ভালোবাসেন। সে প্রায় এমন সন্দেহ কর্‌লে যে তা'কে লক্ষ্য কর্‌বার জন্যই বৌদির এই নৈশ উত্থান। তা'র নিজস্ব গোপনতায় এই অনাহূতপ্রবেশ তা'র ভালো লাগ্‌লো না। আর ভালো লাগ্‌লো না মানসীর চোখে ধারালো হাসির ঝিলিমিলি।

'আমারও তা-ই দশা। বড় গরম', মৃদু, চাপা স্বরে, যেন কী গোপন কথা জানাচ্ছেন, মানসী বলে' উঠ্‌লেন। বলে'ই নিঃসৃত করলেন দীর্ঘ, নিম্ন হাসি। চাঁদের ঘোলা আলোয় তাঁর সুন্দর শাদা দাঁতের সারি ঝল্‌সে উঠ্‌লো।

শ্রীলতা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তা'র ইচ্ছে হ'লো, এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে সরে' পড়্‌তে, নিজের ঘরে গিয়ে খিল এঁটে দিতে। এই মুহূর্ত্তে।

তা'র কানের কাছে মৃদু, অন্তরঙ্গ সুরে মানসীর স্বর শোনা গেলো, 'রাত কত হ'লো?'

শ্রীলতা তীব্রভাবে মুখ ফেরালে তা'র বৌদির দিকে।—'কী হয়েছে? অমন ফিস্‌ফিস্ করে' কথা বল্‌ছো কেন?'

'আমি শুধু জান্‌তে চেয়েছিলুম, ক'টা বাজ্‌লো।' মানসীর স্বরে কপট সরলতা।

'আড়াইটে হবে বোধ হয়। কি বেশিও হ'তে পারে,' অপেক্ষাকৃত নরম সুরে শ্রীলতা বল্‌লে।

'তুমি কি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এলে?'

শ্রীলতা তা'র উৎপীড়কের মুখোমুখি সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। কণ্ঠস্বর শান্ত করলে চেষ্টা করে'।—'হ্যাঁ— এই তো খানিকক্ষণ।'

'কী ভাগ্যি তুমি জেগে আছো। আমার একটুও ঘুম পাচ্ছে না।'

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, শ্রীলতা মানসীর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো।—'হ্যাঁ, তোমার চোখ বড় বেশি চক্‌চক্‌ কর্‌ছে। এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। কী হয়েছে তোমার ?'

'আমার মন যেন কেমন কর্‌ছে,' রুদ্ধস্বরে মানসী বল্‌লেন।

'Nerves,' শ্রীলতা একটু ভেবে বল্‌লে, 'বোধ হয় তুমি ঘরসংসারের এটা-ওটা নিয়ে বড্ড বেশি ভাবো ?'

'জানি নে তা-ই কিনা।' মানসী একটু থাম্‌লেন, পরে যেটা বল্‌বেন, সেটাকে একটু বেশি জায়গা দেবার জন্য, 'এই আশ্বিন মাসের রাতগুলো যেন কেমন। হঠাৎ মাঝরাতে হাওয়া জেগে ওঠে, যেন কী কথা কইতে চায়। শুয়ে-শুয়ে ঘুম আসে না চোখে।' বিপক্ষের পরিভাষা মানসীর ভালো করে'ই জানা ছিলো।

শ্রীলতা কোনো কথা বল্‌লে না। তা'র ভিতরে-ভিতরে আত্মিক বমি-ভাব্ গোমছের হচ্ছিলো। উঃ, এর স্থূলতার অসহনীয়তা! কেউ যেন একটা কালি-মাখা, মোটা বুড়ো আঙুল দিয়ে তা'কে টিপে-টিপে

দেখ্‌ছে। কেন একজন আর-একজনকে একা থাকৃতে দিতে পারে না?

মানসী আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলো, মুখে তা'র বিষাদ। হঠাৎ সে বলে' উঠ্‌লো, 'দেখ্‌ছো মেঘ?'

'বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে, বৌদি,' মনে-মনে শ্রীলতা বল্‌লে, 'একটু বেশি নাটুকে হ'য়ে পড়্‌ছে। আর্টের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে একটুখানির জন্য। এটা আশা করা যায় নি তোমার মত উঁচুদরের অভিনেত্রীর কাছ থেকে।' মুখে বল্‌লে, 'দেখ্‌ছি তো।'

'আচ্ছা, কী মনে হয় তোমার এই কালো-কালো নরম মেঘগুলোকে দেখে?'

'তোমার কী মনে হয়, শুনি?'

'আমার এইমাত্র মনে হচ্ছিলো, যেন ওরা লুকিয়ে রেখেছে কোনো গোপন কথা।'

'কী কথা?' শ্রীলতার কাছ থেকে যে-কথা প্রত্যাশিত, সে তা-ই বল্‌লে। সে-ও খেল্‌ছে তা'র খেলা।

'আমি কী জানি!' মানসীর চোখের পাতা মুহূর্ত্তের জন্য আনত হ'লো তাঁর চোখের উপর। ঈষৎ কেঁপে উঠ্‌লো লম্বা, কালো পলকের সার। তারপর চোখ

খুলে, শ্রীলতার মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে বল্‌লেন, 'তুমি জানো না ?'

শ্রীলতা যেন নিজেরই অজান্তে একটু পিছনে সরে' এলো। বল্‌লে, 'ঘুম পাচ্ছে আমার।'

'এখনই ?'

'এই ঠাণ্ডা হাওয়া—মনে হচ্ছে, শুলেই ঘুমিয়ে পড়্‌বো।'

একটু সময় মানসী চুপ করে' রইলেন। তারপর, 'কী ভাব্‌ছিলে তুমি একটু আগে ?' হঠাৎ তিনি একটা সোজা আক্রমণ কর্‌লেন। 'অবিশ্যি,' পরের মুহূর্ত্তে তিনি জুড়ে দিলেন, 'তুমি নিজেও হয়-তো তা জানো না। আমরা যখন একা থাকি, আর রাত হয় গভীর—সেই অন্ধকারে কী যে আমরা ভাবি, কী যে আমরা না ভাবি।'

শ্রীলতার চীৎকার করে' উঠ্‌তে ইচ্ছে কর্‌লো। ইনি তা'কে পরাজিত কর্‌বেনই, দীপ্তিতে কঠিন, স্পর্দ্ধায় নিষ্ঠুর এই মেয়ে—তা'কে বেঁক্‌তেই হবে তাঁর অন্ধ, উত্তপ্ত ইচ্ছার চাপে। তাঁর সেই ইচ্ছাকে সে অনুভব কর্‌লো যেন একটা অন্ধ, মন্থর শারীর শক্তি তা'কে একটু-একটু করে' ঠেসে ধর্‌ছে। সে তা দেখ্‌তে পেলো মানসীর উজ্জ্বল চোখে, যা'র দিকে

সে তাকিয়ে রইলো, যেন মুগ্ধ। তা'কে সে ঘৃণা করে—মানসীর চোখের সেই আত্ম-সচেতন আলো-কে, তবু তা থেকে সে ফেরাতে পারছে না চোখ। যেমন, অনেক সময়, যে-জিনিস আমরা দেখতে চাই নে, মনের কোনো দুর্ব্বোধ বিকৃতির ফলে তা'রই দিকে আরো বেশি করে' তাকিয়ে থাকি।

'পার্থপ্রতিম কী লিখেছে তা'র চিঠিতে?' হঠাৎ মানসী জিজ্ঞেস করলেন। এমন স্বরে, যেন কোনো প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনই হয় নি, যেন গোড়া থেকেই এ-কথা হচ্ছিলো।

শ্রীলতা এর জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলো। 'বাঁচা গেলো, এটা যে এসেছে,' মনে-মনে সে বল্‌লে, 'বাঁচা গেলো। এসেছে যখন, শিগ্‌গিরই শেষ হ'য়ে যাবে।' শিগ্‌গিরই ছাড়া পাবে, ভাবতে সে খুসি হলো—যদিও সব চেয়ে অসহ্য এখনই। যেমন, ডাক্তার আস্‌বে অস্ত্র করতে, রোগী তা'র আগের দিন-রাত ভয়ে অবশ হ'য়ে থাকে, তবু পরদিন সকালে যখন ডাক্তারের আবির্ভাব হয়, একটু আশা হয় তা'র প্রাণে, যদিও তখনই তা'র আতঙ্কের চরম। শিগ্‌গিরই, যা-ই হোক্, শেষ তো হবে।

মুখে শ্রীলতা বল্‌লে, 'তুমি আমার চিঠি দেখতে গেলে কেন?' যথেষ্ট ঝাঁঝ ছিলো তা'র কণ্ঠস্বরে।

'দেখি নি ব'লেই তো জিজ্ঞেস কর্‌ছি। খামের উপর লেখা দেখে যেন মনে হ'লো পার্থর। কী লিখেছে ?'

কবিতাটার টুক্‌রো-টুক্‌রো কথা শ্রীলতার মনে পড়্‌লো। মনে পড়্‌লো পার্থপ্রতিমের সযত্ন-বিন্যস্ত, নিখুঁত, 'সাহিত্যিক' হস্তাক্ষর—বড় বেশি সুন্দর, বড় বেশি 'সাহিত্যিক'। সে-হাতে যা-কিছুই লেখা হোক্‌, মনে হবে প্রেসের কাপি। চিঠি লেখ্‌বার জন্য তা নয়। মানুষটার মতই তা'র ভাব—অতি-মার্জ্জিত, অতিরিক্তরকম সভ্য এবং সরকারি। আর সেই হাতের লেখার খানিকটা নমুনা তা'র কাছে পাঠানো—কী নির্ব্বোধ কাজ, কী স্থূল! কী প্রচণ্ড এর হিউমার-হীনতা! শ্রীলতা কখনো ভাবে নি, পার্থপ্রতিমকে দিয়ে এ-রকম কাজ হ'তে পারে। কবিতা! কবিত্ব-গিরি ফলাবার চমৎকার সময় বটে! 'আপনাকে পাঠালুম এই কবিতা—আপনারই জন্যে লেখা।' পার্থ-প্রতিমের যা-ই হোক্‌, শেষ পর্য্যন্ত মনে হয়েছে, তা'র জন্যে একটা কবিতা লিখে তা'কে ধন্য কর্‌তে! কবিতা! ছোটখাটো, চমৎকার একটা সার্মন, ছন্দের বুনোনিতে পরিপাটি করে' গুছোনো। সার্মনে শ্রীলতার রুচি নেই। তা'কে এই সমস্ত কথা বলা—ছেলে-

মানুষকে নীতি-উপদেশ, উঁচুদরের কথার রঙ্‌চঙে খেলেনা—তাকিয়ে দেখ্‌বার মত, নিয়ে সময় কাটাবার মত কিছু। উঃ, এই লিখ্‌নেওয়ালাদের আত্ম-সর্ব্বস্বতা, জীবনের ঘটনা নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌বার অক্ষমতা, যে-কোনো মুস্কিল থেকে পালিয়ে তা'দের কথার কুয়াশা গা ঢাকা দেবার অভ্যেস! তা'দের দুর্ব্বলতা, তাদের নিষ্ফলতা!

'কী লিখেছে?' মানসী আবার জিজ্ঞেস কর্‌লেন।

'কেন তুমি তা জান্‌তে চাও?' হঠাৎ হাওয়া লেগে শ্রীলতার বুকের ভিতরটা যেন শির্‌শির্ করে' উঠ্‌লো। শাড়ির আঁচলটা সে আরো নিবিড় করে' গায়ে জড়িয়ে নিলে।

'বলো না। তা'তে তোমার ভালোই হবে।'

'আমার ভালোর জন্য এত ভাবনা তোমার।'

মানসীর দৃপ্ত রক্তিম ঠোঁটের কোণ পাৎলা, সূক্ষ্ম হাসিতে বেঁকে গেলো। 'আমি বলি কী,' আবার সেই রুদ্ধস্বর এনে তিনি বল্‌লেন, 'খামকা মন-খারাপ করে' লাভ নেই।'

'মন-খারাপ তো কই করি নি।'

'যদি না করে' "থাকো" সে তো আরো খারাপ। আরো খারাপ।' হল্‌দে চাঁদের নিচে মানসীর চোখ

হেসে উঠ্‌লো। 'তুমি কি বল্‌বে, এ-ও তোমার গায়ে লাগে নি—এই অপমান?'

'অপমান কিসের?'

'বেশ কথা বল্‌ছো! কী সাহস, কী দুঃসাহস! এত জাঁক ওর কিসের যে—'

'থাক্‌, বৌদি, আর ঘাঁটিয়ে লাভ কী? যা'র যেমন ইচ্ছে, সে তা-ই তো কর্‌বে।'

'আমি আগেই বলেছিলুম,' মানসী যেন শ্রীলতার কথা শুন্‌তেই পেলেন না, 'আমি গোড়া থেকেই জান্‌তুম, যে গরিব, সে গরিবই। ওর কাছে যা এসে-ছিলো, ও কী করে' বুঝ্‌বে তা'র মূল্য!'

'ওর কাছে সব মূল্যই হয়-তো অন্যরকম।'

'কী করে' হবে! কী করে' হবে!' তীব্র চাপা গলায় মানসী বল্‌তে লাগ্‌লেন, 'বড় সমাজে তো কখনো মেশে নি। তুমি ভুল করেছিলে ওকে অতটা আমল দিয়েই।'

শ্রীলতা তা'র বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে' রইলো। তাঁর এ-সব কথার আন্তরিকতায় সন্দেহ করা অসম্ভব। স্পষ্টত, তাঁর মানে বেশ একটু ঘা লেগেছে। মানসীর, শ্রীলতা জান্‌তো, জাতিবিচার অতি প্রখর, তিনি ভয়ানক উঁচু-নাক লোক। মানসীর

বাবা শুধু তাঁর ঘোরেল বুদ্ধির মূলধন নিয়ে জীবন আরম্ভ করেন; যুদ্ধের সময় কী করে' যেন পাট-রপ্তানির ব্যবসায় ঢুকে হঠাৎ বড়লোক হ'য়ে যান্। নতুন-বড়লোকের মেয়ে, মানসীর বাল্যকালও অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যে কেটেছে। ঐশ্বর্য্যে অনভ্যস্ত, ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতম ব্যবহার তিনি জান্‌লেন। এককালে টানাটানি ছিলো, তাই টাকার মূল্য তিনি বুঝ্‌লেন, শিখ্‌লেন টাকাকে শ্রদ্ধা করতে। টাকাই হ'লো তাঁর একমাত্র বিশ্বাস। টাকা যা'র নেই, সে-ও, তাঁর পক্ষে, নেই। দারিদ্র্যের সঙ্গে লেশমাত্র সংস্পর্শ তিনি এড়িয়ে চল্‌তেন সর্ব্বান্তঃকরণে, দারিদ্র্যকে তিনি ভয় কর্‌তেন। কেননা, সেটা তাঁরই বাল্যের অবস্থার স্মারক। আর তিনি সেই সব জিনিসকেই ঘৃণা কর্‌তেন, যা তাঁকে মনে করিয়ে দিতো—আগেকার কথা। যা'কে বলা যেতে পারে স্পর্শদোষ, তাঁর পক্ষে তা বিভীষিকা। জাত সবার আগে। তাঁর জীবনের যা-কিছু উচ্চ আশা, যা-কিছু সাধনা, সব ঐ টাকার বেড়া-দেয়া সাম্প্রদায়িকতাকে অবলম্বন করে'। সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন; আমরা যে যা চাই, তা-ই হয়। তাঁর কৌলীন্যের শুভ্রতায় কোনোরকম কলঙ্কের ছায়া তাঁর পক্ষে মৃত্যুযন্ত্রণা। আশ্চর্য্য নয়, পার্থপ্রতিম সম্বন্ধে মনে-মনে তিনি একটু তীব্রভাবেই

অনুভব করবেন। ব্যাপারটা যেন তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগত অপমান। এ-ব্যাপারটাই তাঁর পক্ষে অসহ্য যে কেউ টাকা সম্বন্ধে, সমাজে উচ্চ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এমন উদাসীন হবে। এটাকে তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মনে-মনে পার্থপ্রতিমকে তিনি সন্দেহ করছিলেন নির্ব্বোধ বলে'। কুমুদনাথ যখন এ-বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তিনি অবিশ্যি মর্ম্মাহত হয়েছিলেন, স্তম্ভিত হয়েছিলেন। কিন্তু কুমুদনাথ যখন চিঠি লিখ্‌লেনই, তিনি তখন চেষ্টা কর্‌লেন কোনোরকমে ব্যাপারটার সঙ্গে নিজকে মানিয়ে নেবার; মনে কর্‌লেন—যাক্, মজা মন্দ হবে না; আস্ত একটা বুনোকে পোষ মানানো—খেলাটা ভালোই। (তাঁর নিজস্ব কৌলীন্যের বহির্ভূত যে-কেউ অবিশ্যি আস্ত বুনো; পার্থপ্রতিমের সঙ্গে শ্রীলতার মেলামেশা তিনি কখনোই ভালো চোখে দেখ্‌তে পারেন নি—আর, সে-কথাই যদি ওঠে, শ্রীলতার অনেক জিনিসই তিনি পছন্দ কর্‌তে পার্‌তেন না—প্রকৃতপক্ষে নয়) কিন্তু যা হ'লো, তা যে হ'তে পারে, মানসীর পক্ষে তা কখনো কল্পনা করা অসম্ভব ছিলো। সৌভাগ্য হাতের কাছে এসে বল্‌ছে, 'আমাকে নাও', আর সে, কিনা রইলো মুখ ফিরিয়ে। মানুষ এত বোকাও হয়!

'বোকা! বোকা!' তিনি বলে' উঠ্‌লেন, 'আমাদের

সাহায্যে ও একটা মানুষ হ'তে পার্‌তো, কোথায় যে উঠ্‌তে পার্‌তো তা ও এখন ভাব্‌তেও পারে না। কী হবে ওর জীবনে? ও পচ্‌বে ওর অন্ধকার খুপ্‌রিতে ওর গরিবিয়ানার দেমাক নিয়ে।'

'তা-ই দাও না ওকে। তুমিই বা এত ভাব্‌ছো কেন ওর কথা?'

'আমি কেবল ভাব্‌ছি, কিসের জোরে—'

'হয়-তো আছে কোনোরকম জোর। বাইরে থেকে আমরা কতটুকুই বা বুঝ্‌তে পারি।'

'আসল কথাটা অন্যরকম।'

'কী সেটা?'

'তোমার মন পার্থর প্রতি দুর্ব্বল—এখনো।'

শ্রীলতা তা'র নিচের ঠোঁটের এত কোণ কাম্‌ড়ে ধর্‌লো—এত জোরে যে প্রায় রক্ত বেরিয়ে এলো।—'যদি কখনো দুর্ব্বলতা হ'য়েই থাকে তো—আছে।'

'ঠিক তোমারই মত কথা হ'লো! আমি ভেবেছিলুম, তোমার একটু লজ্জা আছে অন্তত।'

'লজ্জাকে তারস্বরে ঘোষণা কর্‌লেই লজ্জা ঢাকে না।'

'থাক্‌, তুমি আর কথা বোলো না। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো যে তোমার শরীরে রক্ত নেই। তুমি

যদি চাইতেই, তুমি পার্‌তে না ওকে তোমার পায়ের উপর লুটিয়ে ফেল্‌তে।'

ক্ষীণ একটু হাসি শ্রীলতার ঠোঁটের উপর খেলা করে' গেলো।—'বৌদি, তুমিই বা ওকে অবজ্ঞা কর্‌তে পার্‌ছো না কেন? যে-জিনিসের আমরা কোনো দামই দিই নে, তা হারালে অত ছট্‌ফট্‌ করি নে। তুমিই বা কেন ভুল্‌তে পার্‌ছো না?'

'আমি ভুল্‌বো! আমার শরীর খড় আর ন্যাক্‌ড়া দিয়ে তৈরি নয়। অবাক হচ্ছি তোমাকে দেখেই।'

'আমি কী কর্‌লে তোমার খুব স্বাভাবিক মনে হ'তো? কী চাও তুমি আমার কাছ থেকে?' শ্রীলতা, যেন কর্ত্তব্যের প্রেরণায়, জিজ্ঞেস কর্‌লে। তা'র মনে হচ্ছিলো, তা'র সাম্‌নে দাঁড়ানো এই দীপ্তিময়ী যুবতীর উপর তা'র আধ্যাত্মিক কল্যাণের ভার—যাঁর কাছে তা'কে সব স্বীকার কর্‌তেই হবে, প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার্‌বে না যাঁর কোনো কথা। আর তা'র ক্লান্ত লাগ্‌ছিলো—ভয়ানক, ভয়ানক ক্লান্ত।

'শোনো—একটা কথা।'

'কী, বলো?'

'তুমি আর পার্থর সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখ্‌তে

পারবে না। তোমার নিজের কথা তুমিই জানো, কিন্তু তোমার দাদার—আমার সম্মান—'

'তোমাদের সম্মানের কোনো হানি হয়', শ্রীলতা আস্তে-আস্তে বল্‌লে, 'এমন কাজ আমি কর্‌বো না।'

'ও যদি আবার আসে—'

'আমি তোমাকে বল্‌তে পারি, ও আর আস্‌বে না।'

বিছানায় শুয়ে, শ্রীলতা চোখ খুলে তাকিয়ে রইলো অন্ধকারের দিকে। কী সে কথা, যা সে তা'র নিজের কাছে বল্‌তে চাইছে, বল্‌তে পারছে না? সে ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌লো—বরং না-ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌লো। শুধু স্তব্ধ, স্তব্ধ হ'য়ে থাক্‌তে—শুধু নিঃসাড় হ'য়ে থাক্‌তে এই রাত্রির মাঝখানে। যথেষ্ট হয়েছে মানসীর সঙ্গে মুখোমুখিত্বেই। ক্লান্ত, ক্লান্ত; সে যদি শুধু অন্ধকারের মধ্যে মিশে যেতে পার্‌তো—তা'র হৃদয়ে এই অতল স্তব্ধতা। জান্‌লার দিকে সে একবার তাকালো—ফ্যাকাশে-ধূসর, ভোর হ'লো বলে'। না কি, মরা চাঁদের আলো বিছিয়ে রয়েছে আকাশ ভরে', মেঘে-মেঘে প্রতিহত হ'য়ে? ভাব্‌তে তা'র ভালো লাগ্‌লো, কাল সকালে উঠে দেখ্‌বে রোদ, নতুন একটা দিন। নতুন, নতুন দিন।

শ্রীলতা পাশ ফিরে চোখ বুজ্‌লো। প্রতিদিন জীবন

নতুন করে' জন্ম নেয়, পার হ'য়ে যায় কত মৃত্যু। ঐ সূর্য্যের আলোয় প্রাণের অজস্রতা। শ্রীলতা মনে-মনে ছবি আঁক্‌তে লাগ্‌লো পরের প্রভাতের। খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়্‌লো।

পূর্ব্বরাগ

পার্থপ্রতিম ভাবের মানুষ। তা'র মন বাইরের প্রেরণায় সাড়া দেয় সহজেই: যেন এক হাওয়ার লঘু ছোঁয়ায় সে ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে তারে-তারে, সহজে তা'র রেশ মিলোয় না। কোনো ঘটনাকে হয়-তো সে তা'র মনের উপর দিয়ে বয়ে' যেতে দিলে আল্‌গোছে, বিশেষ খেয়াল কর্‌লে না—কিন্তু পরে হয়-তো দেখ্‌লে, তা'রই প্রতিধ্বনিত সুরে ছেয়ে গেছে মনের নেপথ্য। দুর্দ্দম তা'র কল্পনা: যে-কোনো ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করে' তা তা'কে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতো—কোন্ রহস্য-লোকে, কোন্ অদৃশ্যে। প্রায় একটা ব্যাধির মত, তা'র এই কল্পনাশক্তি—সে তা'কে সাম্‌লাতে পার্‌তো না কিছুতেই, বন্যার মত তা প্রবল। তা'র মনে জাগ্‌তো ছবি—ছায়ায় আভাসে ইঙ্গিতে অস্পষ্টতায় যেন ছম্‌ছম্

করছে ঘুমন্ত বন। সে মগ্ন হ'য়ে যেতো তা'র মধ্যে, ভুলে' যেতো মূল ঘটনা, হারিয়ে ফেলতো স্থূল উপ-লক্ষ্যটাকে। বাস্তবকে, প্রাকৃতকে সে বেশিক্ষণ রাখতে পারতো না চোখের সামনে: তা'র তরঙ্গায়িত কল্পনায় কোথায় তা ডুবে যেতো। শ্রীলতা ঠিকই ভেবেছিলো—যেখানে জীবনের ঘটনার, ঘটনাপ্রসূত সমস্যার মুখোমুখি হ'তে হয়, সেখানে পার্থপ্রতিম একেবারে অক্ষম, নিষ্ফল। যেখানে দৃঢ় সঙ্কল্পে নিতে হবে কঠিন কাজ, সেখানে সে শিশুর মত অসহায়। সে করতে পারতো না কিছুই, শুধু ভাবতে পারতো।

এখন, শ্রীলতার সঙ্গ সে পেয়েছে যতদিন ধরে', পার্থপ্রতিমের মন তা'কে গ্রহণ করেছে বুদ্ধিতে, উজ্জ্বল করে' তা'কে দেখেছে বিদ্যার পরিমণ্ডলে। এবং আর-কিছু নয়। সে ভালোবেসেছে তা'র সঙ্গে গল্প করতে, তা'র সঙ্গে পত্র বিনিময় করতে; কারণ এই একটি লোক যা'র সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করা যায় যে কথা কইলে সে বুঝতে পারবে, হাসতে পারবে ঠিক জায়গায়—এবং যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো প্রসঙ্গে এমন কিছু তা'র বলবার থাকবে, যা শোনবার মত। শ্রীলতা যে মেয়ে, তা'র এ-পরিচয় ছিলো চাপা পড়ে'; সেদিক থেকে তা'র দিকে তাকিয়ে দেখবার খেয়াল পার্থপ্রতিমের

হয় নি। সে-রকমভাবে, অন্তত নয়, যা'তে তা'র হৃদয় আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। ওরা দু'জন পরস্পরের যতই কাছে এসে থাক্‌, পার্থপ্রতিমের মধ্যে একটা আত্ম-সম্পূর্ণতা ছিলো, একরকমের উদাসীনতা, যা পরোক্ষে যেন জানিয়ে দিতো যে শেষ পর্য্যন্ত এতে কিছু এসে যায় না। সে হয়-তো কিছু কবিতা লিখে থাক্‌তে পারে শ্রীলতাকে মনে করে', কিন্তু সেটা নেহাৎই সৌখিন ব্যাপার, মনের রঙিন ঝল্‌সানি; তা'র অন্তরেই রয়েছে যে-আনন্দ, তা'র খানিকটা আকস্মিক উপ্‌চে-পড়া। বস্তুত, সেই কবিতাই, কাব্য-উপভোগের সেই রস-নিবিড় আবহাওয়াই শ্রীলতাকে রেখেছিলো প্রচ্ছন্ন করে': আত্ম-মগ্ন, আত্ম-বিস্মৃত, পার্থপ্রতিম শ্রীলতাকে ভালো করে' দেখ্‌বারই সুযোগ পায় নি—সত্যি-সত্যি সে কেমন।

কিন্তু ব্যাপার যা হ'লো, তা'র পরে পার্থপ্রতিমের চমক ভাঙ্‌লো। শ্রীলতাকে সে দেখ্‌তে পেলো—এই প্রথম দেখ্‌তে পেলো—তা'র দীপ্তির আকর্ষণে, তা'র চোখে-ঝলক-লাগানো আবেষ্টনীর মধ্যে নয়—তা'কে দেখ্‌তে পেলো বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে বিশাল নির্জ্জন। সেখানে সে একা। সেখানে সে বিশেষ। দেখ্‌তে পেলো নিজের মনের অন্ধকারে তা'র ছবি।

সেই ছবির চারদিকে কল্পনার কত রঙিন সুতোর টানা-পোড়েন। ছবি কখন্ বলি? যখন একটা জিনিসকে আমরা ভাব দিয়ে দেখি, নিজের অন্তরের মধ্যে নতুন করে' তা'কে সৃষ্টি করি; সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, যখন তা উন্মোচিত হয় আমাদের দৃষ্টিতে—বিস্ময়ে, অপরূপত্বে। নিজকে তা'র মধ্যে দিতে পার্‌লে তবে তা ছবি হয়। যেটা ছবি, সেটা ছবির বস্তু যতখানি, তা'র চেয়ে বেশি হচ্ছে ছবিকার। তা'র যে-দেখা সে আঁকে কি লেখে, তা'রই ভিতর দিয়ে সেই বস্তু পায় রূপের সম্পূর্ণতা, তা'তেই তা'র রহস্য নিজকে অতিক্রম করে' লীলায়িত হ'য়ে ওঠে। শিল্পীর মনে লাগে বিস্ময়: এ যে এমন, তা তো কখনো জানি নি।'

তেম্‌নি, পার্থপ্রতিমও নিজের মনে বলে' উঠ্‌লো, 'এ কী আশ্চর্য্য!' অলক্ষিতে কখন্ শ্রীলতা ছুঁয়ে গেছে তা'র মন: সে জান্‌তেও পারে নি। শ্রীলতার সঙ্গে তা'র বিয়ে—সেটা তা'র পক্ষে অভাবনীয়; এবং যখন সেটা উল্লিখিত হলো, সেটাকে উড়িয়ে দিতে সে মুহূর্ত্তের দ্বিধা করে নি। কিন্তু একদা যে তা উল্লিখিত হয়েছিলো—এটা তো রয়ে' গেলো, এবং তা'র মত লোকের পক্ষে, যা'র কাছে ভাব আর বাস্তবের ভেদ খুব স্পষ্ট নয়—

তা-ই যথেষ্ট। সেটাকে সে তত সহজে উড়িয়ে দিতে পার্‌লে না, তা চাইলোই বা কই। বরং, ভাবনাটাকে সে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিলে; সে হঠাৎ আবিষ্কার কর্‌লে, তা'র মনের অনেকটা জায়গা ছেয়ে গেছে শ্রীলতা সম্বন্ধে কৌতূহলে আর জল্পনায়। যা'কে সে এতদিন নেহাৎই দূরে রেখে এসেছিলো নৈর্ব্যক্তিকতার রাজ্যে, তা'র কাছে আস্‌বার সম্ভাবনা যেই হ'লো (এবং সে-সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করে'—প্রত্যাখ্যান করেছে বলে'ই বোধ হয়), অম্‌নি তা'র মন কম্পিত হ'য়ে উঠ্‌লো উৎসুকতায়, সে জান্‌তে চাইলো, আরো বেশি জান্‌তে চাইলো। এম্‌নিই হয় ওর মত স্বভাবের লোকের। যখন কোনো জিনিস ঘটে, সেটাকে অনায়াসে ঘট্‌তে—কি না-ঘট্‌তে— দেয়, বিশেষ খেয়াল করে না; কিন্তু পরে—একটু পরে, তা নিয়েই তা'র মন উচ্ছল হয়ে ওঠে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে।

পার্থপ্রতিমের মন থেকে-থেকে উঠ্‌ছে কেঁপে, যেন সূর্য্যের প্রতীক্ষায় উষার গোলাপি আকাশ রোমাঞ্চিত। এখনো ওঠে নি সূর্য্য, শুধু তা'র প্রস্তাবনায় দিগন্ত আভাময়। আকাশ রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌ছে। সম্ভাবনায়, প্রত্যাশায়। কাছে পেয়েও পার্থপ্রতিম যা'কে পেতে চায় নি, আজ তা'র মন সুর দিয়েছে তা'কে ঘিরেই। সেখানে রহস্যের পার নেই।

পার্থপ্রতিম ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো শ্রীলতার দেখা পেতে। কিন্তু বাধা আছে, সে অনুমান কর্‌লে, বাধা তৈরি হ'য়ে উঠেছে। তা'র সে কবিতার প্রাপ্তি-স্বীকারও আসে নি। যথেষ্ট আভাস তা-ই। দিন কেটে যাচ্ছে: রিচি রোড নীরব। কোনো শব্দ নেই। এই ছেদ কি আর উত্তীর্ণ হওয়া যাবে না? কিন্তু কেন, কেন? এর কী দরকার ছিলো? এমন কেন হবে যে একটি মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে হবে, না হয় তা'র মুখ দেখ্‌তেও পাবো না? কী অন্যায়। কী অবিচার। যেন এম্‌নিতেই একজন মানুষের আর-একজনের সঙ্গে মেশ্‌বার স্বাভাবিক অধিকার নেই। কেন আমরা মিছিমিছি গায়ে-পড়া ব্যবস্থা দিতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত সম্পর্ককে জটিল করে' তুলি? আমি যদি একজনকে চাই, আমি তা'কে চাই; কেন তা'র পিছনে কোনো ধরা-বাঁধা উদ্দেশ্য থাকৃতেই হবে? আমি যে তা'কে চাই, এই তো যথেষ্ট কারণ। কেন চাই? বন্ধুতা বিরল; আরো বিরল অন্তরঙ্গতা: যে-বন্ধুকে মনে-মনে ভাবি, সমস্ত জীবনেও তা'কে পাওয়া যায় না। তবু, সেইজন্যেই, য়া'র মধ্যে তা'র এতটুকু ভগ্নাংশও দেখ্‌তে পাই, মন ছোটে তা'রই দিকে। আমরা একজন আর-একজনের কথা বুঝি নে, বোবা

চোখে তাকিয়ে থাকি পরস্পরের দিকে; তাই যখনই শুন্‌তে পাই একটু অনুরণন, দেখ্‌তে পাই কোনো চোখে পরিচয়ের ঝিলিমিলি, তখনই মন কূল ছাপিয়ে যায় আনন্দে, কৃতজ্ঞতায়। মন চায় তাঁকে, যে আমার ভাষা বোঝে, যে অনেকটা আমারই মত, যে আমার স্বজাতি। সহজে তাঁকে পাওয়া যায় না: যদি কারো মধ্যে তাঁর খানিকটা পাই, কী করে' তাঁকে ছেড়ে দিতে পারি, কী করে' তাঁকে হারিয়ে ফেল্‌তে পারি?

কেন এ-রকম হ'তে গেলো, পার্থপ্রতিম বার-বার নিজের মনে বল্‌তে লাগ্‌লো, এ-সব হবার কী দরকার ছিলো? যেখানে মেলা এত সহজ, সেখানে কেন এই মূঢ় অন্তরায়? সঙ্গে-সঙ্গে তা'র এ-ও মনে পড়্‌লো যে শ্রীলতা ইচ্ছে করলেই হেলায় উত্তীর্ণ হ'য়ে আস্‌তে পার্‌তো এই মূঢ়তা; কিন্তু—সে তা ইচ্ছে কর্‌ছে না। কা'কে পার্থপ্রতিম দোষ দিচ্ছে, রাগ কর্‌ছে কা'র উপর? বিশ্বাস করা শক্ত যে এ ব্যাপারে শ্রীলতার মনেও বিকৃতি ঘটেছে। এতে কী এসে যায়, একচুল কী এসে যায়? শ্রীলতা কি তা বোঝে না? তবে কেন সে নিজকে সরিয়ে নিলো এমন করে'? পার্থপ্রতিমও কি, তা হ'লে, মিলিয়ে যাবে, সমস্ত ব্যাপারটা মুছে ফেল্‌বার চেষ্টা কর্‌বে

যেন কিছুই নয়? কিন্তু তা'র মনের মধ্যে যে দশদিক থেকে কথা কয়ে' উঠেছে হাওয়া, নদীতে জেগেছে ঢেউ।

নতুন দিন

আবার পূজোর ছুটি। কল্‌কাতা বহির্গমনের আয়োজনে মর্ম্মরিত। প্রতিবার এই আইন-মাফিক হাওয়া-বদলের পালা। শরীরটা বদ্‌লি হয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়—আর আমরা মনে করি, খুব হ'লো। আসলে, যদিও, ফিরে আসি ছুটি-সম্ভোগ থেকে আরো বেশি ক্লান্ত হ'য়ে। কাজের রুটিন সহ্য হয়, সহ্য না করে', অন্তত, উপায় নেই; কিন্তু ছুটির রুটিন আমাদের মনের অবরোধ, তা অপমান করে আমাদের মনুষ্যত্বকে। সেটাই বেশি মর্ম্মান্তিক।

কিন্তু, খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে জান্‌লা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শ্রীলতা ভাব্‌লে, কিন্তু কী সুন্দর এই আকাশ, কী অনির্ব্বচনীয় নীল। সোনালি-আলোর গানে-গানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত গুঞ্জরিত হচ্ছে। বকের পাখার রঙের মস্ত মেঘগুলো ভেসে চলেছে

নিরুদ্দেশ আলস্যে ; যে-আলো তা'দের উপর প্রতিহত, মনে হয়, তা'রা যেন নিজেদের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত করছে। এত উজ্জ্বল আলো, আলোর চেয়ে বেশি কিছু মনে হয়। এই আকাশের দিকে তাকালেই ইচ্ছে করে, রেলগাড়িতে ছুটে চলি এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ; সবুজ দিগন্তরেখা বার-বার ঘুরে যাক্ আমাকে প্রদক্ষিণ ক'রে—আকাশ থেকে নতুন আকাশে, নীল থেকে নীলতরোতে। কী মোহ এই আলোয়, মনকে যেন জড়িয়ে ধরে অস্পষ্ট স্মৃতির মত, পুরোনো, পরিচিত কোনো ক্ষীণ গন্ধের মত। প্রাত্যহিক জীবনের যত কাজ, যত ভাবনা—ইচ্ছে করে, সব ভুলে' গিয়ে চুপচাপ বসে' থাকি। একটা মেঘ শ্রীলতার দৃষ্টিপথ থেকে আস্তে-আস্তে অন্তর্হিত হ'লো। রেখে গেলো অতল, উজ্জ্বল নীল। চোখ যেন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে : আকাশের এই আলো যেন মদের মত, তা'তে নেশা ধরে' যায়। চোখ বুজে আসে, মধুপানে পরিশ্রান্ত ভ্রমরের পাখার মত। শ্রীলতা তা'র দৃষ্টি সরিয়ে আনলে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়।

কুমুদনাথ আর মানসীর মধ্যে শিলং পাহাড় আর বিন্ধ্যাচলের তুলনামূলক সমালোচনা চল্‌ছিলো। গেলো বছর সমুদ্র ; এ-বছর, তাই, পাহাড় হ'তেই হবে।

প্রসঙ্গক্রমে, ভারতবর্ষের ভদ্রগোছের পাহাড় সব ক'টাই উল্লিখিত হচ্ছিলো। তাঁরা মন ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিলেন না।

হঠাৎ, তাঁদের আলাপের মাঝখানে, শ্রীলতা বলে' উঠ্‌লো: 'ভবানীপুরের এক মেয়ে-কলেজের জন্য ইংরিজি পড়াবার লোক চায়। আমাকে নেবে, তোমার মনে হয়, দাদা?'

কুমুদনাথ একটা জ্বলন্ত দেশ্‌লাইয়ের কাঠি মুখের কাছে তুল্‌ছিলেন; একটু থেমে বল্‌লেন, 'তা'র মানে? তুই চাক্‌রি নিবি নাকি?'

'ভাব্‌ছিলুম তো।'

'কেন, হঠাৎ তোর এতই টাকার দরকার হ'য়ে পড়্‌লো?'

'টাকার জন্যে নয়। যদিও—নিজের পয়সা খরচ কর্‌বো ভাব্‌তে ভালোই লাগ্‌ছে।' মানসী ভুরু উত্থিত করে' বাঁকা দৃষ্টিতে শ্রীলতার দিকে তাকালেন। তা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে' শ্রীলতা বল্‌লে, 'তা ছাড়া, সময় যে কাটে না কিছু না কর্‌লে।'

'ঠিক জানিস্‌ যে মাষ্টারির কাজ তোর ভালো লাগ্‌বে?'

'যে-ক'দিন লাগে।'

'এমন যদি হয়', কুমুদনাথ বল্‌লেন, 'যে এটাকে তুই নিতে চাচ্ছিস্ অন্য-কোনো জিনিসের অভাবে, তা হ'লে বরং না নিলি।'

শ্রীলতা শান্তস্বরে বল্‌লে, 'তা নয়। এতদিন তো কাট্‌লো একভাবে—এবার হোক্ না একটু অন্য রকম। এটাও একরকমের ছুটি।'

কুমুদনাথ কিছু বল্‌লেন না। বুঝ্‌লেন। পাইপের ধোঁয়ার তাঁর মুখ আচ্ছন্ন। 'পাগ্‌লামি!' হঠাৎ মানসীর ধারালো স্বর শোনা গেলো, 'স্রেফ পাগ্‌লামি। লোকে কী মনে কর্‌বে? বল্‌বে না কি—"ভদ্রলোকের কাণ্ডটা ছাখো—বোনকে দিয়েছে কাজ কর্‌তে"!'

'ও-ধরণের কথা যা'রা বলে', কুমুদনাথ উত্তর দিলেন, 'তা'রা যা-কিছুই বলুক্—এসে যায় না।'

'তুমি তো ঐ রকমই ভাবো: নিজের সম্মান তুমি তুমি নিজে খোয়াবে—তাও বুঝ্‌তে পার্‌বে না।'

'এত তোমার ভয় কেন, মানসী, পাছে কেউ এমন সন্দেহ করে যে সে যা মনে করেছিলো, তা'র চেয়ে একটুও কম টাকা তোমার স্বামীর আছে?'

'কাজ জিনিসটাই খানিকটা ভাল্‌গার। মানুষ কাজ করে পেটের দায়ে। যেখানে কাজ, সেখানেই বুঝ্‌তে হবে অভাব। অভাব থাক্‌লে লোকে তা গোপন কর্‌বার

চেষ্টা করে: অভাব নেই, তবু তা বুঝ্‌তে দিতে যাবো কেন?'

'তুমি ভুলে' যাচ্ছো তোমাকে এই সুন্দর আলস্য জোগাবার জন্য একজনকে কাজ কর্‌তে হয় আট ঘণ্টা রোজ। তা'র অসহ্য ভাল্‌গারিটি তোমাকে এতটুকু পীড়া দেয় বলে' তো মনে হয় না।'

মানসী ঠোঁট বাঁকিয়ে হাস্‌লেন।—'পুরুষদের কথা আলাদা। তা'রা তো কাজ কর্‌বেই। তা'রা কাজ না কর্‌লে চল্‌বে কী করে'?'

'আর মেয়েরা?'

'মেয়েরা শুধু থাক্‌বে। সেটাই শোভা। তা'রা যে আছে, সে-জন্য তাদের কিছু দাম দিতে হবে না: সে-দাম দেবে পুরুষ।'

কুমুদনাথ মৃদুস্বরে হেসে উঠ্‌লেন।—'তোমার বিশ্বাসের জোর আছে যা হোক্‌। ভাগ্যিস এ-সময়ে বাঙ্‌লাদেশেই জন্মেছো।'

'অন্য রকম হ'লে কী হতো, জানি নে,' গ্রীবার সুন্দর ভঙ্গী করে' মানসী বল্‌লেন, 'কিন্তু এ-পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে বর্ত্তমান যা ব্যবস্থা, তা'তে আমি পরম তৃপ্ত। কারো সঙ্গে চাই নে জায়গা-বদল কর্‌তে।'

যে-মুহূর্ত্তে মানসী কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছিলেন,

শ্রীলতা আবার খবরের কাগজে চোখ ডুবিয়েছিলো : এতক্ষণে কথা কইলো, 'তুমি খুসি থেকো, বৌদি, অন্যের খুসিতে বাধা দিতে এসো না।'

'বাধা আমি দিচ্ছি নে ; দিতে গেলেও ফল হবে না, জানি ; আমি শুধু আমার মত জানাচ্ছি। তুমি যে কাজ নেবার কথা ভাব্‌ছো, আমি তা একেবারেই পছন্দ কর্‌তে পারি নে। মাষ্টার্‌নি—কী বিশ্রী শুন্‌তে।'

শ্রীলতার কানের গোড়া একটু লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। বল্‌লে, 'স্বাধীন হবার একটা আনন্দ আছে—তুমি তা বুঝ্‌বে না।'

'স্বাধীন! রোজ ঘড়ি-ধরা সময়ে হাজিরা দিয়ে মাসের শেষে মাইনে নিয়ে আসা—তা'কে বলো স্বাধীন হওয়া! আমি স্বাধীনেরও বেশি হ'তে চাই—আমি চাই রাজত্ব কর্‌তে।'

'সব চেয়ে বড় রাজত্ব হচ্ছে নিজের উপর।'

শ্রীলতা এত আস্তে বল্‌লে কথাটা যে মানসী তা শুন্‌তে পেলেন না, না শুন্‌তে পেয়েও গ্রাহ্য কর্‌লেন না, বোঝা গেলো না। 'তা ছাড়া,' তিনি বল্‌লেন, 'মেয়ে-মানুষ কোনো কাজকর্ম্ম নিলেই অকালে বুড়িয়ে যেতে থাকে। সেটা অন্যায়। যৌবনকে নষ্ট কর্‌বার অধিকার কোনো মেয়ের নেই। আমার মতে,' হঠাৎ স্বর নামিয়ে

অন্তরঙ্গস্বরে তিনি বল্‌লেন, 'তোমার এখন বিয়ে করা উচিত। বিয়ে কর্‌বার জন্যই মেয়েদের সৃষ্টি।'

'যেমন', কুমুদনাথ বলে' উঠ্‌লেন, 'ডিম পাড়্‌বার জন্যেই মুর্‌গির সৃষ্টি। মুর্‌গি না থাক্‌লে আমরা ডিম খেতে পেতুম না, মেয়েলোক না থাক্‌লে পার্‌তুম না বিয়ে কর্‌তে—সুতরাং মুর্‌গির জন্য, মেয়েলোকের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

মানসীর মুখ একটু কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লো। এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে' তিনি বল্‌লেন, 'আমার সব চেয়ে রাগ হয়, পুরুষ যখন গায়ে পড়ে' মেয়েদের প্রতি দরদ দেখাতে আসে। মেয়েদের স্বার্থ সব চেয়ে ভালো বোঝে তা'রা নিজেরাই।'

'সে-বিষয়ে,' কুমুদনাথ বল্‌লেন, 'যদি বা কিছু সন্দেহ ছিলো, তোমাকে দেখে তা দূর হ'লো।'

'তোমার এখন উচিত, শ্রীলতাকে বিয়ে কর্‌তে পারে, এমন-কোনো ছেলের খোঁজ করা। চারদিকে তাকিয়ে দেখে একজনকেও কি চোখে পড়ে না?'

শ্রীলতা হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো, তীরের মত সোজা। 'আমার ভাবনা তোমাদের ভাব্‌তে হবে না: তোমরা বরং বিন্ধ্যাচল যাবে কি শিলং, তা'র

মীমাংসা করে' ফেলো। সেটা ভালো কাজ কর্‌বে।' বলে' সে দ্রুতপদে সে-ঘর থেকে চলে' গেলো।

শ্রীলতার গায়ের ধাক্কায় কম্পমান পর্দ্দার দিকে তাকিয়ে কুমুদনাথ বল্‌লেন, 'কেন তুমি খামকা ওকে খোঁচাতে আসো? তোমার বোঝা উচিত, ওর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করতে গিয়ে জেতে, কা'রো সাধ্য নেই।'

'তুমি ওকে প্রশ্রয় দিয়েছো বলে'ই তো ও যা খুসি কর্‌বার সাহস পায়।'

'যা খুসি কর্‌বার যোগ্যতাও ওর আছে যে।'

'কথা, ফাঁপা কথা! তোমরা ভাই আর বোন কথার প্যাঁচেই ঘুরে মর্‌বে সারা জীবন।'

'আমার জীবনের কথা আর বলো কেন? ও তো শেষ হ'য়েই গেছে—তোমাকে যেদিন বিয়ে করেছি।'

ঝল্‌সে উঠ্‌লো মানসীর চোখ, টেবিলের উপর কনুই রেখে সাম্‌নের দিকে তিনি একটু ঝুঁকে পড়্‌লেন। তাঁর সব চেয়ে মর্ম্মান্তিক মৃদুস্বরে বল্‌লেন, 'কিন্তু সেদিন জীবনকে শেষ করে' দিতে তোমার আগ্রহও তো কিছু কম দেখি নি। আর এটা সব সময় মনে রেখো, তোমাকে আমি দয়া করে' বিয়ে করেছি।'

'পাগল! তা কি ভুল্‌তে পারি? তোমার দয়া যে মর্ম্মে-মর্ম্মে টের পাচ্ছি প্রতি মুহূর্ত্তে।'

'আর—তুমি যদি তোমার বোনের ভালোই চাইতে, তা হ'লে আমি যেমন বলছি, তা-ই করতে।'

'থাক্,' কুমুদনাথ ক্লান্তস্বরে বললেন, 'অন্যের ভালো করতে কেন আমরা ব্যস্ত হই? একবার না-হয় একজনের একটু খারাপই হ'লো।'

নিজের ঘরে, শ্রীলতা তা'র চাকরির দরখাস্ত লিখতে বসলো। কয়েকদিন ধরে'ই সে খবরের কাগজের চাকরি-খালির বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করে' আসছে—এটার মত তা'র কোনোটা পছন্দ হয় নি। বাঙলাদেশে মেয়েরা এখনো ইচ্ছে করলে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এটা যদি ফসকায়, নিতে হবে অন্য একটা। শ্রীলতা ভাবলে, বেছে-বেছে আরো কয়েকটা জায়গায় সে দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবে। যেটা হয়। একটা হবেই। শ্রীলতার মনে এখন আর কোনো সন্দেহ ছিলো না যে সে মাষ্টারনি হবে। নিজকে সে স্পষ্ট দেখতে পেলে সেই ভূমিকায়। ভালোই লাগলো তা'র ভাবতে। যা-ই হোক্, সেটা কিছু তো। অন্তত, সেই জগত থেকে আলগা হ'য়ে যাওয়া, যেখানে তা'র বৌদি 'রাজত্ব' করেন। সে এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে—এটা নিয়ে আর ওটা নিয়ে: এখন অত্যন্ত দরকার হ'য়ে পড়েছে তা'র পক্ষে নতুন একটা দিনের।

কলমটার জন্যে সে তা'র টেবিলের ড্রয়ার খুল্‌লো। খুলেই চোখে পড়্‌লো সবার উপরে শক্ত, শাদা একটা খাম। পার্থপ্রতিমের চিঠি। আগের দিন সেটা এসেছিলো। সে অবাক হয়েছিলো, পার্থপ্রতিম যে তা'র কাছে আবার চিঠি লিখেছে। সে তা আশা করে নি। শ্রীলতা খামটা তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ উল্টে-পাল্টে দেখ্‌লে, যেন তা'তে করে' কোনো গভীর অর্থ সে ইঙ্গিতে বুঝে ফেল্‌বে। তারপর চিঠিটা বা'র করে' আর-একবার পড়্‌লো।

পার্থপ্রতিম লিখেছে :

'এমন চুপচাপ কি হ'তেই হবে? যে-ব্যাপারটা তুচ্ছ, অর্থহীন, পরের মুহূর্ত্তেই ভুলে' যাবার মত, সেটাকে যদি দাঁড় করে' তুলি মাঝখানে—তা যে কী হাস্যকর, তাও কি আপনার খেয়াল হয় না? আমি বসে'-বসে' ভাব্‌ছি, এত বড় সহজ জিনিসটাও যে আপনার চোখ এড়াবে! বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে কিছুতেই। যদি রাগের ব্যাপার হয়, তা দেখুন, আমার কী দোষ, দোষ দিন্ আপনার দাদাকে। আমি আর কী কর্‌তে পার্‌তুম—আপনি, অন্তত, বুঝ্‌বেন, এই ভরসা রাখি মনে। আর রাগটাও মনে-মনে ঠিক কল্পনা কর্‌তে পার্‌ছি'নে—আপনি গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে কারো সঙ্গে একটি কথা কইছেন না, কি

কম খাচ্ছেন, কি সারাদিন শুয়ে থাক্‌ছেন—আপনার সম্বন্ধে এর যে-কোনোটা ভাব্‌তেই হাসি পায়। রাগ যদি হ'তেই হয়, তা হ'লে তা-ই হোক্‌, কবি যাকে বলেছেন "rich angel"—তা ভেঙে পড়ুক্‌ আমার উপর উত্তাপে আর সৌন্দর্য্যে ; সে-বিপদ বরং গ্রহণ কর্‌তে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই বিলুপ্ত হ'য়ে যাওয়া, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাওয়া—এর কী দরকার? আগে যেমন ছিলো, তেম্‌নি আবার সব হ'তে পারে না কেন?

'আমার বিশ্বাস, আপনি অবিচার কর্‌ছেন নিজেরই প্রতি—হয়-তো কিছু না ভেবে, না-হয় তো কোনো অন্ধ ধারণা আপনাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু, দোহাই দেবতার, আমরা যেন কোনো ভাণ না করি, আমরা যেন সহজ হ'তে পারি। মনের সত্যকে যেন কিছুতেই চাপা পড়্‌তে না দিই। অনেক সময় এমন হয় যে যেটা ক্ষণিক, যেটা অপ্রাসঙ্গিক, সেটাই মনে হয় যেন সব জুড়ে রয়েছে। তখন তা'র ভিতর দিয়ে আমাদের দেখ্‌তে পারা উচিত—অন্তত, চেষ্টা করা উচিত। তা হ'লেই আর কোনো জটিলতা থাকে না। একটু যদি সোজা দৃষ্টিতে আমরা দেখ্‌তে পারি, তা হ'লেই অনেক সংশয়, অনেক বিরোধের দুঃখ থেকে নিজকে বাঁচাতে পারি এবং অন্যকেও।

'আমি সত্যি কথা বল্‌বো—আমার এখন ইচ্ছে কর্‌ছে আপনাকে আবার দেখ্‌তে। মনে পড়্‌ছে আপনার শাড়ির চপল ভঙ্গী—সেই ভঙ্গীর সঙ্গে এত বেমানান, এমন বিসদৃশ—এই সব! আপনি যা ছিলেন, তা-ই তো আছেন; তবু কেন—কেন আমাকে এই চিঠি লিখ্‌তে হচ্ছে? যদি ভুল করে' থাকি, তা হ'লে তো বুঝ্‌তেই পার্‌বো; কিন্তু আমার মনে হয় না, আমি ভুল করেছি।

পার্থপ্রতিম।'

পড়া শেষ করে' শ্রীলতা চিঠিটা আবার খামে ভরে' ড্রয়ারে রেখে দিলে। তারপর কলম তুলে নিয়ে লিখ্‌তে আরম্ভ করলো দরখাস্ত।

প্রণয়-জিজ্ঞাসা

শ্রীলতাকে দ্বিতীয় চিঠি ডাকে দিয়েই পার্থপ্রতিম বুঝ্‌তে পার্‌লে, সে ভুল করেছে। চুপ করে' সে দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তার মাঝখানে—লাল ডাকবাক্সটার নিষ্ঠুর, নিরুত্তর মুখ-গহ্বরের দিকে তাকিয়ে। এখন যদি চিঠিটা ফিরিয়ে আনা যেতো! কিন্তু যে-চিঠি ডাকে দেয়া

হয়েছে, তা উচ্চারিত কথার মত, নিক্ষিপ্ত তীরের মত— তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। তবু মুখের কথা যায় হাওয়ায় হারিয়ে; তীর কোথায় গিয়ে পড়ে, আর খোঁজ পাওয়া যায় না—চিঠি সম্বন্ধে সেটুকু ভরসাও করা যায় না। চিঠি থেকে যায়।

মন-খারাপ করে পার্থপ্রতিম বাড়ি ফিরে এলো। মনে-মনে সে ভাব্‌বার চেষ্টা কর্‌লে, চিঠিটার কী ফল হবে শ্রীলতার মনে। সে দেখ্‌তে পেলো শ্রীলতাকে, শক্ত, শাদা খামের উপর তা'র হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে আছে—হয়-তো অবাক হচ্ছে, হয়-তো বুঝ্‌তে পার্‌ছে, কী আছে এর ভিতর। সে তা'কে দেখ্‌তে পেলো—খামটা ছিঁড়্‌তে; তারপর—পড়া হ'য়ে গেছে, চিঠিটা পড়ে' আছে তা'র কোলের উপর, সে ভুলে' যাচ্ছে সেটাকে তুলে রাখ্‌তে। তাকিয়ে আছে সাম্‌নের দেয়ালের দিকে—একটু হাসি কি তা'র ঠোঁটের কোণে? দুর্ব্বল, দুর্ব্বল! শ্রীলতার আনুমানিক মন্তব্যের তীব্র প্রতিধ্বনি জেগে উঠ্‌লো পার্থপ্রতিমের মনে; নিজকে উদ্দেশ্য করে' সে বল্‌তে লাগ্‌লো, দুর্ব্বল, দুর্ব্বল! অর্থহীন চিঠি। অর্থহীন, নিষ্প্রয়োজন, অকারণ। অযাচিত, তা'র উপর। অযাচিত, অবাঞ্ছিত। পার্থ-প্রতিম তা'র চিঠিতে দম্ভ আর নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া

কিছু দেখ্‌তে পেলে না। প্রার্থী হ'য়ে গিয়ে পিঠ-চাপ্‌ড়াবার চেষ্টা! দীনতাকে গোপন কর্‌বার জন্য আত্ম-বিশ্বাসের উদ্ধত অভিনয়! কী করে', উঃ, কী করে' সে ও-চিঠি লিখ্‌তে পার্‌লে; কী করে', লিখ্‌তে-লিখ্‌তেই সে বুঝ্‌তে পার্‌লে না, সে কী কর্‌ছে? ভেবে-ভেবে পার্থপ্রতিম নিজকে দস্তুরমত অসুখী করে' তুল্‌লো।

কিন্তু মনের কোনো প্রচ্ছন্ন কোণে সে এ-ও অনুভব কর্‌লে যে সে যা লিখেছে, তা সত্য। সত্য, সত্য। কিন্তু বল্‌তে গেলে তা এমন মেকি শোনায় কেন? সে তা'র কথাগুলো মনে কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লো—আর একা ঘরে বসে' নিজের কাছেই লাল হ'য়ে উঠ্‌লো লজ্জায়। এই কথাই কি আরো ভালো করে' বলা যেতো না? সহজ করে'? ছোট-ছোট কথায়? কিন্তু তা যে শোনাতো প্রণয়-নিবেদনের মত: আর সেটা হ'তো আরো খারাপ। কেননা, শ্রীলতাকে প্রণয়-নিবেদন কর্‌তে সে চায় না। চায় না কি? পার্থপ্রতিমের কপাল ঘেমে উঠ্‌লো: যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ভালোবাসার সূত্রপাত সেখানেই, যেখানে আমরা একজনকে বিশেষ-একজন করে' দেখি, বিচ্ছিন্ন করে'

দেখি অসংখ্য মানুষের সাধারণতা থেকে। যেখানে সে স্বতন্ত্র, নিঃসঙ্গ। সেই নিঃসঙ্গতা, জ্বলন্ত তারার চতুঃসীমায় যেমন অন্ধকার—তা যখন ধরা পড়ে, তখনই সে হ'য়ে ওঠে রহস্যময়। ভেবে-ভেবে কূল পাই নে তা'র। তখনই তা'র উপমা খুঁজে আনি চাঁদ থেকে আর সূর্য্য থেকে: তা'কে মনে হয় যেন নিশীথরাত্রির মত অনির্ব্বচনীয়। তা'কে বর্ণনা কর্‌তে গিয়েই কথা হ'য়ে ওঠে কবিতা। অন্বেষণের শেষ নেই; আবিষ্কারের শেষ নেই। যে-মুহূর্ত্তে ভালোবাসি, তা'র মধ্যে সৃষ্টি করি রহস্য: যা'কে ভালোবাসি তা'র মধ্যে যদি রহস্য না থাক্‌তো, কী করে' তা'কে ভালোবাস্‌তে পার্‌তুম? একজন যখন আর-একজনের প্রেমে পড়ে, আমরা দর্শকরা বলাবলি করি: 'কী যে ও দেখ্‌তে পেয়েছে ওর মধ্যে, বুঝতে পারি নে।' কিন্তু সেটাই যে ঠিক: তা আমাদের বুঝ্‌তে পার্‌বার কথাও নয়। আমরা যদি তা-ই দেখ্‌তে পেতুম, তা হ'লে প্রেমে পড়্‌তুম যে আমরাই।

এই হচ্ছে গোড়াকার কথা। এ ছাড়া ভালোবাসা হয় না: যা হয়—আমরা ভালো করে'ই জানি, কী হয়। আর এর পরে—এর পরে কী?, কী করে' তা'কে কাছে পাবো, কী করে' তা'কে গ্রহণ কর্‌বো জীবনের মধ্যে?

পুরুষের এই স্বভাব যে সে চায় তা'র ভাগ্যকে জয় করতে। যুদ্ধ তা'র রক্তে: যা সে অর্জ্জন করে নি, তা ভোগ করতে তা'র পৌরুষ লজ্জিত হয়। সে ভালোবাসে বিপদের তীব্রতা; সে ভালোবাসে নিজকে ঢেলে দিতে দুঃসাহস থেকে দুঃসাহসে। জীবনের সঙ্গে জুয়োখেলায় সে দেউলে হ'য়ে যাবে সে-ও ভালো: তবু বসে'-বসে' হাত বাড়ালেই যা পাওয়া যায়, তা নিয়ে তৃপ্ত থাকবে না। যেমন সে গড়ে' তোলে তা'র কীর্ত্তি প্রতিকূলতার মুখে, যেমন সে অনিচ্ছুক ভাগ্যকে কঠিন পণে পরাজিত করে—তেম্নি সে চায়, যা'কে ভালোবাসে, তা'কে জয় করতে। কী করে'? না, প্রেমে, প্রেমের শক্তিতে। তা'কে ঘরে বসে' হাতের কাছে পেতে চায় না: দুঃসহ মূল্য দিয়ে তা'কে দুর্লভ করে' তুলতে চায়। কারো হাত থেকে সে তা'র প্রিয়াকে নেবে না: প্রিয়া তা'র কাছে আত্ম-সমর্পণ করবে নিজেরই অন্তরের প্রেরণায়।

এ-সব কথা যে পার্থপ্রতিমের মনে স্পষ্ট রূপ নিয়েছিলো, তা নয়। শুধু তা'র মধ্যে ইচ্ছার ঢেউয়ের ছলছলানি; অস্ফুট আভাস, অনির্দ্দেশ্য ছায়া। তা'কে সে ভাষা দিতে পারে না—ভাষা দিতে, হয়-তো, চায়ও না। শুধু চুপ করে' শোনা—নিজের মনের

কানাকানি। শ্রীলতা যখন এসেছিলো কাছে; সে তা'কে চায় নি, কিন্তু এখন—সে গেছে দূরে সরে', লুপ্ত হ'য়ে গেছে নীরবতায়—এখন তা'র কেবলই মনে হচ্ছে, কী করে' আমি তা'র মূল্য দিতে পারি? কী করে' ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারি তা'র আচ্ছাদন, কী করে' তা'কে দেখ্‌তে পারি মুখোমুখি? কোথায় সে-আলো, যা'তে আমার চোখে উদ্‌ঘাটিত হবে তা'র পরিচয়? কাছে থেকে যে আমার চোখে পড়ে নি, আজ দূরে থেকে তা'রই ছায়া যে আচ্ছন্ন করে' ফেল্‌ছে আমাকে। পার্থপ্রতিমের মনে পড়্‌লো, সে কুমুদনাথকে লিখেছিলো, 'কোনো মির‍্যাক্‌ল্‌ কখনো ঘট্‌বে না।' কিন্তু তা-ই যে ঘট্‌লো: এত বড় মির‍্যাক্‌ল্‌ কী আর হ'তে পারে? তা'র সমস্ত পৃথিবীর চেহারা গেছে বদ্‌লে, কিছুই আর আগেকার মত নেই। যা-কিছু তা'র চোখে পড়ে, তা-ই যেন নতুন, তা-ই যেন এইমাত্র সৃষ্ট হ'লো। এতদিন সে বই পড়েছে, কাব্যচর্চ্চা করেছে, বাস করেছে সাহিত্যের রামধনু-আবছায়ার আড়ালে। আজ যেন হঠাৎ রঙিন ধোঁয়ার সেই পর্দ্দা গেলো সরে', পৃথিবীকে সে প্রত্যক্ষ কর্‌লে প্রথম বার। কে জান্‌তো এত রহস্য আছে পৃথিবীতে, মনে-মনে সে বল্‌লে, কে জান্‌তো আমার মধ্যে আছে এই দুর্ভেদ্য, দুর্ব্বোধ

অরণ্য। সেখানে কি দুঃখ পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠ্‌ছে বিষাক্ত লতার মত, না কি আনন্দ নিজকে ছড়িয়ে দিয়েছে ডালে-পাতায় সবুজ অজস্রতায়? কিছু বোঝা যায় না; শুধু মনে হয়, এ আশ্চর্য্য; এমন আশ্চর্য্য আর-কিছু নেই।

একরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে পার্থপ্রতিম চোখ মেলে' চাইলো। ঘরের মধ্যে অন্ধকার যেন কী কথা কয়ে' যাচ্ছে চুপে-চুপে, চারদিক স্তব্ধ হ'য়ে আছে তা শুন্‌বে বলে'। মশারির ফাঁক দিয়ে আব্‌ছা দেখা যাচ্ছে তা'র ঘরের আস্‌বাব—ধূসর প্রেত-রেখায় নির্দ্দেশিত; দেয়ালের কোণে তা'র আয়নাটা তারার আলোয় দেখা জলের মত ম্লান। এখন আর তা'র এই ঘরকে চেন্‌বার উপায় নেই: এই জিনিসগুলোর যেন একটা নিজস্ব সত্তা আছে—তা প্রকাশ পেয়ে উঠ্‌ছে এই অন্ধকারে, এই ঘুমে-ভরা শূন্যতায়। সারাদিন ভরে' যাদের ব্যবহার করি কিছু না-ভেবে, এখন তা'রা কত দূরে সরে' গেছে—যেন কোন্ অতীতে, কোন্ স্বপ্নে। পার্থপ্রতিম ঘুমের চোখে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ তা'র চোখ গেলো জান্‌লা দিয়ে বাইরের আকাশে। সেখানে ম্লান আধখানা চাঁদ ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে গেছে তা'র দিকে। তা'র আলোয় নেই জোর: জান্‌লার কাছে

এসেই তা হাঁপিয়ে পড়্‌ছে, ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছতে পার্‌ছে না। একটু হয়-তো ফ্যাকাশে আভা অন্ধকারের গায়ে লেগেছে কি লাগে নি। অনেকক্ষণ তা'রা মুখোমুখি তাকিয়ে রইলো—সে আর ম্লান, ক্লান্ত চাঁদ; তারপর চাঁদ অলক্ষিতে অন্তর্হিত হ'য়ে গেলো পার্থপ্রতিমের দৃষ্টি থেকে। হঠাৎ যেন সমস্ত আকাশ ফাঁকা হ'য়ে গেলো; পার্থপ্রতিমের বুকের ভিতরটা উঠ্‌লো মোচড় দিয়ে। সে নেই, সে নেই; আকাশ ভরে' গেছে তা'র বিরহে।

তারপর পার্থপ্রতিম অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমোতে পার্‌লে না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে' উঠ্‌লো ন'টার সময়। ইন্দিরা দু'বার চা নিয়ে ডাকাডাকি করে' ফিরে গেলেন। দিনটা কেমন শূন্য লাগ্‌লো তা'র কাছে—যেন আলোর অন্তর্লীন যে-প্রাণের তেজ, তা নিবে গেছে। চা খেতে-খেতে সে ভাব্‌লে, কিছু-দিন কল্‌কাতার বাইরে গিয়ে একটু ঘুরে আস্‌বে। কোথায় যাবে? যে-কোনো জায়গায়, জায়গাতে বিশেষ-কিছু এসে যায় না। কোনোরকমে কিছু টাকার জোগাড় করা যাবেই। তা'র হঠাৎ মনে পড়্‌লো, শ্রীলতা তা'কে পুরী থেকে যে-চিঠি লিখেছিলো। পুরী সে কখনো যায় নি, যাবার ইচ্ছে অনেকদিন

ধরে'। গেলো বছর হয়-তো যেতো, যদি না—বাকিটা সে নিজকে ভাব্‌তে দিলে না। পার্থপ্রতিম মন ঠিক করে' ফেল্‌লো, পুরীতেই সে যাবে।

দেখা

ভিড়ের ঠেলাঠেলি, হোটেলে এক ঘরে ছ'জনের শোবার ব্যবস্থা, হোটেলের গুরুপাক ও অতি-বিস্তৃত আহার, হাওয়ার ঠেলায় কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বেলে রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে বই পড়্‌বার অসুবিধে—এ-সব সত্ত্বেও পুরী পার্থপ্রতিমের ভালো লাগ্‌লো। আকাশে সূর্য্য; সমুদ্র এত নীল যে চোখে দেখে বিশ্বাস হয় না। আর, নতুন জায়গায় এসে প্রথম কয়েকদিন মন ব্যস্ত থাকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজকে খাপ খাওয়াতে—সেটা মন্দ লাগে না। সব চেয়ে তা'র ভালো লাগ্‌লো নিজের সম্পূর্ণ একাকিত্ব। পরিচিত পারিপার্শ্বিকে নিঃসঙ্গ হ'লেও আমরা যেন ঠিক একা হ'তে পারি নে: বাড়ি, দোকান, পথ-ঘাট—মূক, অচেতন সব জিনিস, তা'রাই পদে-পদে আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে; বলে, 'কেমন আছো?' বলে, 'আরে শোনোই না।' আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হয়-তো আমরা সম্ভাষিত হ'তে চাই নে। কিন্তু পুরী আর

সে পরস্পরের একেবারে অচেনা ; দু'জনে দু'জনকে দূর থেকে দেখে নিচ্ছে আড়চোখে—কথা কইছে না। রূপক বাদ দিলেও, পার্থপ্রতিম সারাদিনের মধ্যে কথা বল্‌তো খুব কমই : সেটাও তখনকার মত, মিলে গিয়েছিলো তা'র ইচ্ছার সঙ্গে।

এক বিকেলে, সমুদ্রের ধার দিয়ে পশ্চিম দিকে হাঁট্‌তে-হাঁট্‌তে সে চলে' এসেছিলো অনেক দূর, যেখানে লোকের ভিড় নেই। চারদিক ফাঁকা ; এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো ফ্যাকাশে-হল্‌দে রঙের কর্কশ জমি, মাঝে-মাঝে ফণি-মনসার ঝোপ। দৃষ্টির বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে একটা বাড়ি, পুরোনো, রঙ্‌-উঠে-আসা—নাটকের দৃশ্যপটের মত। জায়গাটার রুক্ষ বন্ধ্যাভাব পার্থপ্রতিমের মনকে খুসি করলে। এ কারো সঙ্গে মিশ্‌তে আসে না ; নিজের মধ্যে এ সম্পূর্ণ ও নিহিত ; এ সুদূর, এ বিচ্ছিন্ন। এর মধ্যে প্রশ্রয় নেই, সান্ত্বনা নেই। ফণিমনসার কাঁটায় এ নিজকে আগ্‌লে রয়েছে, সবুজের বন্যায় নিজকে বিলিয়ে দেয় নি। এমন সময় আসে, যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি দেয়ায় আর নেয়ায়, সংস্পর্শে আর সংঘাতে ; যখন আমরা বুজে যেতে চাই নিজের মধ্যে। এই বালু-ম্লান, নিষ্করুণ প্রকৃতি যেন মনের সেই অবস্থার দৃশ্যমান রূপ।

পার্থপ্রতিম বস্‌লো, ঘন, নরম বালির উপর পা ছড়িয়ে। খুলে ফেল্‌লো জুতো। তা'র পায়ের নিচে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে সমুদ্র। ঢেউগুলো তা'র পায়ের একটু দূর পর্য্যন্ত এসে ফিরে যাচ্ছে; রাগ করে' আবার ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে আরো জোরে, তবু পার হ'তে পার্‌ছে না সেই সীমা। যেন সমুদ্রকে ঠাট্টা করে' পার্থপ্রতিম তা'র পায়ের আঙুল আরো-একটু বাড়িয়ে দিলে। এক-একটা ঢেউ বন্য সিংহের মত লাফিয়ে পড়ে' যেন তা'র চেয়েও বড় কোনো শক্তির ধাক্কা খেয়ে প্রবল পিছু-টানে নেমে যাচ্ছে। সেই নির্জ্জনতায়, পার্থপ্রতিমের রক্তে এক অদ্ভুত উচ্ছ্বাস লাগ্‌লো; তা'র মনে হ'তে লাগ্‌লো, উপস্থিত মুহূর্ত্তে সে-ই হচ্ছে চরম শক্তি; এই উন্মাদ, বিশাল সমুদ্র নিয়ে সে খেলা কর্‌ছে। এক হাতে কতগুলো ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে সে এক-একটা আগন্তুক ঢেউয়ের গায়ে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মার্‌তে লাগ্‌লো। তা'তে করে' সে আনন্দ পেলো ছেলেমানুষের মত।

পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, দিগন্ত ফেটে পড়্‌ছে লালে-সোনায়। এত ঐশ্বর্য্য কেন, মৃত্যুতে কেন এত সমারোহ? যখনই কোনো বর্ষার সূর্য্যাস্ত পড়েছে পার্থপ্রতিমের চোখে—বাস্‌-এ করে' চৌরঙ্গী দিয়ে যেতে-

যেতে ময়দানের দিকে তাকিয়ে—তা'র একটু মন-খারাপ হ'য়ে গেছে। কী অন্যায়! অজস্র আছে বলে' কি এমন অকৃপণভাবেই খরচ কর্‌তে হয়? এখানে আলোর শেষ নেই, বন্যা নেমেছে রঙে-রঙে; অথচ আমাদের জীবনে এই রঙের, এই আলোর এক কণার জন্য কী আর্ত্ত ভিক্ষা, তা'র অভাবের কী নিষ্ঠুর দৈন্য—কত দুঃখে, কী তীব্র চেষ্টায় মেলে তা'র ক্ষীণতম স্পর্শ। আমাদের জীবনে এত দৈন্য, এত মলিন জীর্ণতা, এদিকে আকাশের গায়ে, ছাখো, কী অকারণ, কী অপ্রার্থিত বাহুল্য। কা'র জন্যে এ-সব? আমাদের, প্রথম কথা, সময় নেই; আমাদের অনেক কাজ, অনেক ভাবনা। আর তা ছাড়া, এত সৌন্দর্য্য আমাদের চোখে সহ্য হয় না। আমাদের কষ্ট হয় তা'র দিকে তাকাতে। মনে হয়, মুহূর্ত্তের মন-ভোলাবার এই খেলা আর কেন, আমরা তো জানি আমাদের জীবন কী। সূর্য্যাস্ত মিলিয়ে যাবে ক্ষণিকে, জীবন তো থাক্‌বে। চোখ বিশ্রাম খোঁজে পরিচিত সাধারণতায়, অভ্যস্ত বিবর্ণতায়। বাস্‌ চৌরঙ্গী থেকে ধর্ম্মতলায় মোড় ঘুর্‌তেই পার্থপ্রতিম অনেক সময় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। যাক্‌, সৌন্দর্য্যের কোনো ভাণ, অন্তত, এখানে নেই: অত্যন্ত অকপট, আন্তরিকভাবেই এ কুশ্রী।

কিন্তু, পার্থপ্রতিম ভাব্‌তে লাগ্‌লো, সূর্য্যাস্তের কল্‌কাতাতেই অর্থ হয়: সেখানেই, সব ব্যস্ততা আর বিক্ষোভের মধ্যে, মানুষকে যেন তা বাণী প্রেরণ করে অন্য-কোনো জগতের, অকল্পিত কোনো শান্তির। এখানে, এই সমুদ্রের উপর, পৃথিবীর বিস্তীর্ণ নীরবতার উপর তা অর্থহীন। এখানে তা মগ্ন নিজের গৌরবে। নিষ্ফলতায় জ্বলে'-জ্বলে' যাচ্ছে এত আগুন—কিছুই তা'র বল্‌বার নেই। তা যেন অনেক দূরের কোনো মায়াপুরীর সখের বাজি-পোড়ানো: আমাদের জীবনের সঙ্গে নেই তা'র কিছুমাত্র সংশ্রব। পার্থপ্রতিমের মনে হ'লো, সে কোনো ছবি দেখ্‌ছে, সুন্দর ছবি—কিন্তু তা'র বিষয় এমন নয় যা তা'র মনকে গভীরভাবে স্পর্শ কর্‌তে পারে। চোখকে তা খুসি করে, মনে এনে দেয় না মোহ। পার্থপ্রতিম একটা ঝিনুকের ধার দিয়ে বালির উপর দাগ কাট্‌তে-কাট্‌তে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

আর হঠাৎ, তা'র আর সূর্য্যাস্তের মাঝখানে অন্য-কিছু এসে দাঁড়ালো। বরং, সূর্য্যাস্তের শরীর থেকেই যেন উঠে এলো এই লালের ঝল্‌সানি—পার্থপ্রতিমের চোখের সাম্‌নে। সিঁদুরের মত লাল। আস্তে-আস্তে তা কাছে আস্‌ছে। শাড়িটার ভঙ্গী পার্থপ্রতিমের চেনা মনে

হ'লো। আগুনের আকাশের গায়ে আগুন জ্বেলে দিলে কে—এই সিঁদুরে শাড়ির আভা? তা এসে পড়্‌লো আরো কাছে: কিন্তু পার্থপ্রতিম আগেই চিন্‌তে পেরেছিলো। সে শরীরের কোনোরকম ভঙ্গী কর্‌লে না, চোখও আন্‌লে না ফিরিয়ে। শুধু, যে-হাত দিয়ে সে বালিতে দাগ কাট্‌ছিলো, তা থেমে গেলো।

শ্রীলতা আগে কিছু লক্ষ্য করে নি; একেবারে কাছে এসে পড়ে' থম্‌কে দাঁড়ালো। একটু ইতস্তত কর্‌লে: কিন্তু না-চিন্‌লেই সব চেয়ে বেশি চেনা হ'তো। তাই সে বল্‌লে, 'আপনি যে!'

'খুব অবাক হ'য়ে যাচ্ছেন তো?'

'ঠিক যে আশা করেছিলুম, তা নয়।'

'আমার কথা শুনুন্ তা হ'লে। আপনারা পর-পর দু' বছর পুরীতেই আস্‌বেন—'

'একেই বলে কপাল। ঠিক ছিলো বিন্ধ্যাচল: শেষ মুহূর্ত্তে হ'য়ে গেলো পুরী। দাদার এক বন্ধু একটা বাড়ি ঠিক করেছিলেন—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের কা'র অসুখ কর্‌লো না কী হ'লো, তাঁদের যাওয়া উল্টে গেলো। বাড়িটা, ফাঁকের উপর, পড়্‌লো এসে আমাদের ঘাড়ে। তাই—'

'বুঝ্‌তে পেরেছি। ভালোই হ'লো; সেইজন্যই তো

আপনাকে দেখ্‌তে পেলুম এইমাত্র, যেন সূর্য্যাস্তে নেয়ে উঠ্‌লেন। আপনার শাড়িটা চমৎকার।'

শ্রীলতা কোনো কথা বল্‌লে না; পার্থপ্রতিম অলস ভঙ্গীতে বসে' রইলো তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে। নীরবতায়, কয়েকটা সোনালি মুহূর্ত্ত গড়িয়ে গেলো।

তারপর শ্রীলতা বল্‌লে: 'কোথায় আছেন অখানে?'

পার্থপ্রতিম একটা হোটেলের নাম কর্‌লে।

শ্রীলতা জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'কেমন লাগ্‌ছে?'

'বেশ। খুব ভালো।'

'কেমন! আমি আপনাকে বলি নি—' শ্রীলতা মাঝ-পথে থেমে গেলো।

'আপনার অনুমোদনের কথা মনে করে'ই এসেছিলুম। এবার বৃষ্টি হচ্ছে না ভাগ্যিস্।'

'একাই এসেছেন?'

'একাই।'

'হোটেল কেমন?'

'যেমন হ'য়ে থাকে। বিশেষ এসে যায় না, যা-ই হোক্। থাকি তো বাইরেই। এবার কোনো আই-সি-এস্-গিন্নি আপনার প্রতিবেশিনী হন্ নি—এখন পর্য্যন্ত?'

'না', শ্রীলতা হেসে বল্‌লে, 'হ'লেই যেন ভালো হ'তো—এক-এক সময় মনে হয়। বাড়িটা এমন নির্জ্জন। মানুষ যা-ই বলুন না, সামাজিক জীব।'

'লোকে তো তা-ই বলে। কিন্তু সমাজের সঙ্গে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হ'লেই কেন গা শির্‌শির্ করে' ওঠে? প্রকর্ষচিত্ত, সূক্ষ্মরুচি, সক্রিয়মনীষা হ'বার দুঃখও কম নয়।'

'কিন্তু—নির্লিপ্তদৃষ্টি, নিরীক্ষাশীল, দার্শনিকমনা হ'লে হয় না? তা'তে আছে খানিকটা মজা।'

'বলেছেন ঠিক কথা। বেশির ভাগ লোকের কথা ভাব্‌তে চমৎকার লাগে—দূরে থেকে। বেশির ভাগ লোককে শুধু তখনই সর্ব্বান্তঃকরণে ভালোবাসা যায়, যখন—এবং যতক্ষণ—তা'রা দূরে থাকে।'

'একটু যদি নেমে আস্‌তে পারেন মাঝে-মাঝে—তা'তে লাভই হবে। অন্তত, নিজের উপভোগের ক্ষেত্রকে এত ছোট করে' আনা কেন?'

'দেখেছি চেষ্টা করে'। কিন্তু মন যে ছট্‌ফট্ করে। মনের মধ্যে এক খুঁতখুঁতেপনার শয়তান সারাক্ষণ উঃ-আঃ কর্‌ছে—তা'কে থামানো যায় না কিছুতেই। ফলে, উপভোগের ক্ষেত্র অত্যন্ত পরিমিত হ'য়ে পড়ে—সে তো ঠিকই। আমি যদি জোন্ ক্রফোর্ডের নাকের ডগা

নিয়ে, সব চেয়ে নতুন রেকর্ডের সব চেয়ে ঢলে'-পড়া, গজল-ঢঙি, রসুনগন্ধি গান নিয়ে, সত্যেন দত্তর কবিতা নিয়ে, এডিসনের প্রতিটি ছোট উদ্ভাবনার সঙ্গে মানব-সভ্যতার এক পা অগ্রগতি নিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'তে পারতুম, তা হ'লে জীবন কী সহজ, কী সুখের হ'তো, ভাবুন তো। কিন্তু হয়-তো', একটু চুপ করে' থেকে পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'বিস্তৃতির হিসেবে আমার যা ক্ষতি, নিবিড়তায় লাভ হয় তা'র ঢের বেশি। আমি যখন উপভোগ করি, এমন গভীরভাবে করি, গণ-উচ্ছ্বাসীরা যা কল্পনা কর্‌তে পারে না। তা-ই মনে করে', অন্তত, সান্ত্বনা পেতে হয়।—কিন্তু,' সমুদ্র থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে শ্রীলতার চোখের উপর রেখে পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না। বেশ নরম বালি।'

শ্রীলতা বল্‌লে, 'আরো খানিকটা হাঁট্‌বো, ভেবে-ছিলাম।'

'তা'র আগে বিশ্রাম করে' নিন্ একটু।'

কৌতূহলে, কৌতুকে ভরা পার্থপ্রতিমের চোখ থেকে শ্রীলতা সরিয়ে নিলে তা'র চোখ। দ্রুত দৃষ্টিতে একবার তাকালে তা'র পিছনে, একটু রইলো চুপ করে'। তারপর বল্‌লে, 'দাদা আর বৌদিকে ফেলে এসেছি—ঐ যেখানে সমুদ্রটা বেঁকে গেছে, তা'র পিছনে।

বৌদি ক্লান্ত বোধ করলেন। বসতে চাইলেন। আমি ভাবলুম, একটু এগিয়ে যাওয়া যাক্ ততক্ষণ।'

পার্থপ্রতিম চুপ করে' রইলো।

'ওঁরা এসে না পড়েন এদিকে,' শ্রীলতা বল্‌লে, 'আমি এখন ফিরে গেলেই বোধ হয় ভালো।'

'যদি যেতেই হয়—' পার্থপ্রতিম বল্‌লে।

শ্রীলতার মুখ নিচের দিকে একটু ঝুঁকে পড়্‌লো।—'একটা কথা', চাপা দ্রুতস্বরে সে বল্‌লে—যেন সময় নেই একেবারেই, 'আপনি ক'দিন আছেন এখানে?'

'হায়!' পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'শূন্যায়মান পকেট। রিটার্ন্‌-টিকিট একটা আছে, এই যা ভরসা।'

'কাল কোথায় দেখা হ'তে পারে আপনার সঙ্গে?'

'যে-কোনো জায়গায়। এখানে?'

'বেশ, এখানেই। আপনি ঠিক আস্‌বেন তো? সাড়ে ছ'টা?'

'কী করে' বলি? ঘড়ি নেই সঙ্গে। সময়ের শাসন সহ্য করেছি চিরকাল—এবার নিচ্ছি তা'র প্রতিশোধ যতটাই বাজুক, কিছু আর এসে যায় না। কী আরাম।'

'বেশ, তা হ'লে', শ্রীলতার ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসি খেলা করে' গেলো, 'চুলোয় যাক্ সময়।'

'অন্তত, সময় থেমে থাক্ কয়েকদিনের মত।'

'আচ্ছা—' শ্রীলতা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। একটুখানি গিয়েই মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, 'কাল।'

'কাল।'

মাঝ-রাস্তায় গিয়ে শ্রীলতা দেখ্‌লে কুমুদনাথ আর মানসী তা'র দিকে আস্‌ছেন। সে থেমে দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে তা'র একেবারে কাছে এসে পড়্‌তে দিলে। 'ক' মাইল হেঁটে এলে?' কুমুদনাথ তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন, 'মুখ-টুক যে লাল হ'য়ে উঠেছে।'

'ওঃ, অনেক', শ্রীলতা বল্‌লে, 'আর ওদিকে গিয়ে কাজ নেই। চলো বাড়ি ফিরি। ক্লান্ত লাগ্‌ছে এবার।'

নতুন রাত্রি

'এত দেরি কর্‌লেন কেন?'

'বা রে! সময় তো আর নেই—আপনিই তো বলেছিলেন।'

'সময় যে আছে, তা এতক্ষণ ধ'রে খুব ভালো ক'রেই টের পাচ্ছিলুম।

'কতক্ষণ ধরে' ?'

'ওঃ, অনেকক্ষণ। একটু পরেই তো অন্ধকার হ'য়ে যাবে।'

'দাদা-বৌদি গেলেন বি-এন্-আর হোটেলে—তাঁদের কোন্ এক আলাপি সেখানে আছে। সে-পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে হ'লো।'

'শেষ পর্য্যন্ত যে এসেছেন, তাইতেই খুসি হয়েছি।'

শ্রীলতা বালির উপর বস্‌লো, পার্থপ্রতিমের পাশে। ধূসর-হ'য়ে-আসা সমুদ্র ছড়িয়ে আছে দিগন্তে। দু'জনে খানিকক্ষণ রইলো সেইদিকে তাকিয়ে, চুপচাপ। একটু অস্পষ্ট লজ্জা তা'দের মাঝখানে। সম্প্রতি যে-সব ঘটেছে, তাদেকে ভাণ কর্‌তে হচ্ছে যেন কিছুই ঘটে নি। অথচ দু'জনেই মনে-মনে অনুভব কর্‌ছে, সে-প্রসঙ্গ তুল্‌তে পার্‌লেই ভালো হ'তো। তা হ'লে একটা ব্যবধান যেতো দূর হ'য়ে: সেটাই, শেষ পর্য্যন্ত, হ'তো সহজ।

'সমুদ্র আজ বড় বেশি চ্যাঁচাচ্ছে', নীরবতা ভাঙ্‌লে শ্রীলতা।

'রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে এই শব্দ শুনি—ঘুমের মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে তা অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে যায়। ডেভিড কপারফিল্ড্ মনে পড়ে।'

'হ্যাঁ—ছোট, শাদা সেই কাঠের ঘর: ঠিক তা'র পাশে সমুদ্র ফেনায়-ফেনায় ভেঙে পড়্ছে দিন-রাত।'

'মনে হয়, আমিই যেন সেই ছোট ছেলে, শুয়ে-শুয়ে ঢেউয়ের শব্দ শুন্তুম—অনেক আগে, কোনো-এক কালে। এতদিন তা ভুলে' ছিলুম নানা বাজে জিনিসে—আজ মুছে গেছে মাঝখানকার সব অবাস্তরতা; নিজকে মনে কর্তে পার্ছি। ছেলেবেলায় যে-সব বই পড়া যায়, তা'রা বড় অদ্ভুত ছাপ রেখে যায় মনে। ভালো করে' কিছুই মনে থাকে না; এখানে-ওখানে ফুটে থাকে দু' একটা ছবি। বড় হ'য়ে এক-এক সময় সন্দেহ হয়—এ কি পেয়েছি কোনো বইয়ে—না কি এ আমারই জীবনের কোনো ঘটনা—দূর কোনো শিশুকালের, অন্য-কোনো অস্তিত্বের? মোট কথা', পার্থপ্রতিম সংক্ষিপ্ত হাসি নির্গত কর্লো, 'ক'দিন ধরে' এ-ধারণা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পার্ছি নে যে আমিই হচ্ছি—কি ছিলুম—ছেলে বয়েসের ডেভিড কপারফিল্ড্।'

'সমুদ্রের শব্দ অনেকক্ষণ ধরে' একমনে শুন্লে আমার মনে হ'তে থাকে যেন সময় অনেক পিছনে সরে' গেছে, যখন পর্য্যন্ত সৃষ্টি আরম্ভ হয় নি। সেখানে কিছু নেই, সেখানে আমি নেই। কেমন ভয় করে।'

'নিজকে নিঃসঙ্গতায় দেখ্তে যে-ভয়, এ তা-ই।

আমরা যে-খোলসের মধ্যে বাস করি, সেটাই আরামের ঃ আমাদের মনকে একেবারে উন্মুক্ত করে' দেখ্‌তে আমরা নিজেরাই সাহস পাই নে।'

'তা ঠিক', শ্রীলতা বল্‌লে, 'আমাদের প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনে নিজেদের সম্বন্ধে যে-ধারণা আমরা করি, তা থেকে যে আমরা একটুও আলাদা, সে-কথা মনে না-কর্‌তে পার্‌লেই বেঁচে যাই।'

'তবু মাঝে-মাঝে একটু উঁকি দেয়া মন্দ নয়।'

'আশ্চর্য্য—আমি ঠিক কেমন, তা পৃথিবীতে অন্য-কেউ জান্‌তে পার্‌বে না কখনো। আমরা লোকের সঙ্গে মিশি, কথা বলি—যা'র সঙ্গে যেমন দরকার, যে যেমন আশা করে। রাত্রির অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে নিজের মনে যে-কথা বলি, তা কখনো কেউ জান্‌তে পার্‌বে না।'

'আর সে-ব্যবস্থাই তো ভালো। শেষ পর্য্যন্ত, একজন মানুষ তা'র নিজেরই সব চেয়ে বেশি। তা'র মধ্যে আছে একটা নির্জ্জনতা, যেখানে একমাত্র নিজের সঙ্গে সে মুখোমুখি। যেখানে সে সব চেয়ে সম্পূর্ণ, সেখানে সে সব চেয়ে একা। সে যদি নিজকে দিতে চায় কারো কাছে, সে সব দেবে, সব—শুধু তা'র নির্জ্জনতাকে নয়।'

'কী এক পৃথিবীতে আমরা বাস করি!' শ্রীলতা

বলে' উঠ্‌লো, 'আমাদের সব ভালোবাসা, অন্তরঙ্গতা—কী তা'র মানে? দু' জনের মনে একটুখানি ছোঁয়াছুঁয়ি হয়-তো হয়—আর আমরা অস্থির হ'য়ে উঠি, কত ব্যাখ্যা করি তা'র, কত জল্পনা তা নিয়ে। অথচ সব সময়—কী অপার ব্যবধান মাঝখানে।'

'সেইজন্যেই তো এত আনন্দ ভালোবেসে। যা'কে ভালোবাসি, সে কেমন জানি নে; তাই তো তা'কে সৃষ্ট করে' নিতে পারি নিজের মনের মধ্যে। একজন আর-একজনকে বলে, "তোমার মত আর দেখি নি কখনো"; আমরা দূর থেকে শুনে হাসি। কিন্তু সত্যি যে তা-ই; তা'র মনে ধরা পড়েছে সেই ব্যক্তির যে-বিশেষ একটি রূপ, তেমন তো তা'র চোখে কখনো পড়েই নি। যা'র কল্পনাশক্তি নেই, সে ভালোবাস্‌তে পারে না।'

'কী সর্ব্বনাশ! পৃথিবীতে কত যে লোক সুখে-শান্তিতে সংসার কর্‌ছে, তাদের কথা ভাবুন একবার। তাদের কী হবে?'

'তাদের জন্য ভাবনার বাজে-খরচ করে' লাভ নেই। তা'রা যা পাবে না, তা নিয়ে আক্ষেপ কর্‌বে না কখনো—কেননা তা'রা জান্‌বেই না যে কিছু বাদ পড়ে' গেলো।'

'কিন্তু তা'রাও কি আর ভালোবাস্‌তে না পারে—তাদের সাধারণ, নিরভিমানভাবে?'

'ভালোবাসার নামে তো কত জিনিসই চলে।'

'আপনার নিজস্ব ব্র্যাণ্ড্‌টা যে ভালোবাসাই, সেটা নিশ্চিত?'

পার্থপ্রতিম মৃদুস্বরে হেসে উঠলো। 'নিজের মন দিয়েই তো আমরা বিচার কর্‌তে পারি—তা'র বেশি পারি নে।'

'কত লোক তো আছে,' শ্রীলতা বল্‌লে, 'যা'রা বল্‌বে: "অত-শত বুঝি নে, এইটুকু বুঝি যে ভালো লাগে, সব সময় ভালোও লাগে না, কিন্তু সে না থাক্‌লে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।" তাদের স্তরে নেমে এলো—না, উপনীত হ'লে হয়-তো দেখ্‌বেন, তাদের সেই ভালো-লাগাতেই তা'রা সার্থক।'

'সে তো নিশ্চয়ই,' সেই ধূসর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে পার্থপ্রতিম শ্রীলতার চোখের সন্ধানে তাকালো, 'সে তো নিশ্চয়ই। তা'রা যে এর বেশি চায়ই নি; তা'রা যে জানেই না, এ ছাড়া কিছু আছে। হয়-তো দেখ্‌বো, শেষ পর্য্যন্ত তাদের অবস্থাই ঈর্ষা কর্‌বার। তা'রা যা চেয়েছিলো, তা পেয়েছে; আমি যা চাই, তা পাবোই, এমন ভরসা করা যায় না। বড় জিনিস চাইবার দুঃখ তো আছেই।'

শ্রীলতা কিছু বল্‌লে না; এবং পার্থপ্রতিমের দিক থেকে ফিরিয়ে নিলে মুখ। আলাপে পড়্‌লো ছেদ। আকাশ ভরে' নাম্‌লো সন্ধ্যা; অন্ধকারে সমুদ্র তা'র দাঁত দেখাচ্ছে। তা'রা দু'জনেই জানে, কী বল্‌তে চায় পরস্পরকে; কিন্তু তাদের মুখের সব কথা ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে তা'র চারদিক দিয়ে, ঠিক জায়গায় ঘা দিতে পার্‌ছে না। আচ্ছাদনে, অন্তরালে সেই কথারই আভাস; কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে স্পষ্ট করে' বল্‌বার সময় এলো, তখনই নীরবতা। যে-কথা বলা হ'লো না, দু'জনের মাঝখানে তা অদৃশ্য মধ্যবর্ত্তী। দূর করো বাধা; প্রকাশ করো পরস্পরকে। না, এখনো নয়, পার্থপ্রতিম নিজের মনে বল্‌লে, এখনো নয়। কী দীর্ঘ সময় আমরা নিই, সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, অতি সহজে যা হ'তে পারে, কী দীর্ঘ সময় নিই তা'র সম্পাদনায়। কিন্তু সেটাই তো স্বাভাবিক, একটি ফলকে রসে ভরে' তুল্‌তে কত সূর্য্য জ্বলে' যায়; মাটি থেকে কী তীব্র আকর্ষণে শিকড়ে-শিকড়ে উঠে আসে অন্ধকার প্রাণের উত্তাপ, প্রতি মুহূর্ত্তে কোষে-কোষে কী কঠিন সংগ্রাম-সামঞ্জস্যের, সুষমার জন্য। যা সুন্দর, যা পরিণত, পরিপূর্ণ, তা কখনো সহজে হয় না। বাইরে থেকে

মনে হ'তে পারে, হঠাৎ ফুটে উঠ্‌লো, কিন্তু নেপথ্যে যে-সৃষ্টির লীলা, সেখানে অক্লান্ত ধৈর্য্য, দীর্ঘ প্রস্তুতি, অজস্র অপচয়। ছোট যে-একটি চারা আজ উঁকি দিয়েছে মাটির তলা থেকে তা'র জন্য দিতে হয়েছে সহস্র বীজের অপমৃত্যুর দাম। প্রকৃতি অতি মন্থর; চট্‌ করে' কিছু করে' ফেলে' সে খরচ বাঁচাতে চায় না; কোনো সৃষ্টির প্রণালীর প্রতি ক্ষুদ্র অংশের জন্য তা'র দারুণ সক্রিয়তা, পরিপূর্ণ কালক্ষেপ। আমরা যদি পরিপূর্ণ স্বাভাবিকতায় কিছু লাভ কর্‌তে চাই, আমাদেরও আন্‌তে হবে সেই সুন্দর মন্থরতা, গম্ভীর ধৈর্য্য। মানুষ তখনই সভ্য হ'লো, যখন সে অপেক্ষা কর্‌তে শিখ্‌লে। যখন সে বুঝ্‌লে হাতের কাছে যা-কিছু পাওয়া যায়, তখন-তখনই তা'র ভিতর দিয়ে চরিতার্থতা খোঁজ্‌বার নিষ্ফলতা। বর্ব্বরের লোভ গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করে; তা'কে উপভোগ বলে না। যেখানে অধৈর্য্য, যেখানে তাড়াহুড়ো করে' যা-হোক্‌ একটা-কিছু ছিনিয়ে নেবার ঝোঁক, সেখানেই অন্তরের দীনতা। যখন আমরা চোখে দেখামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে চাই, মুহূর্ত্তকাল নষ্ট হ'তে দিতে চাই নে, তখনই, বুঝ্‌তে হবে, গ্রহণ কর্‌বার ক্ষমতা আমাদের হয় নি। যে-লোক প্রকৃতপক্ষে সভ্য তা'র

আছে সেই ক্ষমতা; তাই উৰ্দ্ধশ্বাস ব্যস্ততা থেকে তা'র মন স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়। সে অপেক্ষা কর্‌তে জানে—এবং চায়। তা'র ইচ্ছার বস্তুকে সে কাঁচা চিবিয়ে-চিবিয়ে ফেলে' দেবে না; তা'কে ফলে' উঠ্‌তে দেবে উষ্ণ-রক্তিম পক্কতায়, নিবিড় সূর্য্য-রসে।

সভ্য মানুষের ভালোবাসা, তাই, দীর্ঘ সময় নেয়; অনেক স্তর অতিক্রম কর্‌তে-কর্‌তে তা নিজকে প্রস্তুত করে' তোলে পূর্ণতার জন্য। অনেক তা'তে বিচ্ছেদ, অনেক দূরত্ব। তা শুধু কাছে পেতেই ব্যগ্র নয়, কাছে পাওয়ার নিবিড়তাকে সে সুরময় করে' তুল্‌তে চায় নানা অন্তরাল দিয়ে—না হ'লে তা'র তৃপ্তি হয় না। এই তো আমি বসে' আছি, পার্থপ্রতিমের মন ভেবে চল্‌লে, শ্রীলতা আছে আমার পাশে। কী সহজ হ'তো এখন তা'কে আমার কাছে টেনে আনা; কী সহজ, তা'কে এখন তা'র নিজের ভিতর থেকে বা'র করে' এনে স্বীকৃতিতে উন্মোচিত করা। এখনই যদি বলি, যে-কথা এক সময়ে বল্‌তেই হবে! কিন্তু এ-ই তো বেশ; দূর থেকে পাচ্ছি তা'র সৌরভ, তা'র সূক্ষ্মসত্তা যেন মৃদু নেশার মত আমাকে আচ্ছন্ন কর্‌ছে। আমি অনুভব কর্‌ছি তা'র উপস্থিতি যেন আমার রক্তের মধ্যে, আমি

পূর্ণ হ'য়ে আছি তা'কে দিয়ে। যথেষ্ট, এ-ই তো যথেষ্ট; এর বেশি কেন চাইবো?

অন্ধকার। আকাশে কখন্ এত তা'রা ফুট্‌লো? সমুদ্রের জল অন্ধকারে লুপ্ত; শাদা-শাদা ফেনাগুলো চোখে ঠেক্‌ছে স্বপ্নের মত। পার্থপ্রতিম শ্রীলতার মুখের দিকে তাকালো; চোখে পড়্‌লো গ্রীবার একটু নরম রেখা—আর খানিকটা অস্পষ্ট শুভ্রতা। কোনো ম্লান নিশীথ-ফুলের মত, তা'র মুখ। অন্ধকারে ফুল ফুটেছে—কোথায়, বোঝা যাছে না; কিন্তু রাত্রি মদির হ'য়ে উঠ্‌লো তা'র সৌরভে।

আরো অন্ধকার। আরো তারা আকাশে। একটু শব্দ নেই চারদিকে—সমুদ্রের শব্দ ছাড়া। কিন্তু তা এমন একটানা, বিরামহীন, এক-সুরে-বাঁধা যে স্তব্ধতাকে তা ব্যাহত করে না; বরং তা'কে মনে হয় স্তব্ধতারই অংশ, তা থেকে অবিচ্ছেদ্য। স্তব্ধতাকে, এক হিসেবে, তা গভীরতরো করে' তুল্‌ছে; এম্‌নিতে যা ছড়িয়ে যেতো তা সেই চির-পুনরুক্ত শব্দের মধ্যে যেন সংহত হচ্ছে, একট নির্দ্দিষ্ট রূপ পাচ্ছে। দু'জনের অলক্ষিতে, ঢেউয়ের পর সমুদ্রের ঢেউ, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, তারার কম্পনের পর কম্পন, সময় গড়িয়ে যেতে লাগ্‌লো।

তারপর শ্রীলতা মুখ ফেরালে পার্থপ্রতিমের দিকে।

যেন অন্ধকারই চুপি-চুপি স্বরে কিছু কয়ে' উঠ্‌লো। খুব আস্তে-আস্তে শ্রীলতা বল্‌লে, 'আপনার যদি কিছু বল্‌বার থাকে আমাকে, তা বল্‌তে পারেন এখন।'

একটু সময়, পার্থপ্রতিম একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, শ্রীলতার মুখ স্পষ্ট করে' দেখ্‌বার জন্য। তারপর বল্‌লে, 'না, বল্‌বার আর কী আছে। একদিন হঠাৎ আমার মনে অসহ্য ইচ্ছা জেগে উঠ্‌লো আপনাকে দেখ্‌বার—আর সেই দেখা তো আজ হ'লো। এ ছাড়া আর কী।'

'আপনার চিঠি দুটো পেয়েছিলুম—' শ্রীলতা আরম্ভ কর্‌লে।

'থাক্,' পার্থপ্রতিম তাড়াতাড়ি বাধা দিলে, 'ও-সব কথা থাক্।'

'কী দরকার ছিলো লেখ্‌বার? আমি তো বুঝ্‌তেই পার্‌তুম।'

'সমস্ত ব্যাপারটারই কিছু দরকার ছিলো না।'

'কিন্তু কেন আপনি সহজভাবে তা'কে নিতে পারেন নি—যে-জিনিস নেহাৎই বাইরের, যা তুচ্ছ, অবান্তর, তা'র কথা অত না ভেবে?'

'গর্ব্ব!' পার্থপ্রতিম বলে' উঠ্‌লো, 'দুর্ব্বলতা! কত সময় আমরা ইচ্ছে করে' জটিল জীবনকে আরো

বেশি জটিল করে' তুলি। কিন্তু তা-ই তো মানুষের ধর্ম্ম।'

'গর্ব্ব ছিলো আমারও। আমি ভাবি নি, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

'আমি জান্‌তুম, দেখা আবার হবে। কিন্তু কে জান্‌তো তা হবে এত শিগ্‌গির—আর তা সমুদ্রে ভরে'-যাওয়া এই রাত্রিতে, এই আশ্চর্য্য অন্ধকারে।'

বাতাস ঠাণ্ডা হ'য়ে আস্‌ছিলো: হঠাৎ শ্রীলতার সমস্ত শরীর ঈষৎ কেঁপে উঠ্‌লো। 'কী রাত্রি,' অর্দ্ধস্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ কর্‌লে, 'কী অন্ধকার!'

তারপর আর-কিছু নয়। শেষ হ'লো—যে-জন্যে তাদের এত ভয়, এত উৎপীড়ন মনে-মনে। সে-কথা বলা হ'লো। যন্ত্রণার মত—ও-সব কথা উচ্চারণ করা; বুকের ভিতরটা মুচ্‌ড়ে-মুচ্‌ড়ে যেন প্রতিটি কথা নিঃসৃত হচ্ছে। নিজের উপর তা অত্যাচার। কিন্তু তা শেষ হ'লো—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই তা'র শেষ। আর ভয় নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এই অন্ধকারের জন্য। কী সান্ত্বনা, কেউ কারো মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছে না: সেইজন্যই এটা সম্ভব হ'লো। অন্ধকারে দুটো অশরীরী স্বর, তা'র বেশি তা'রা কিছু নয় পরস্পরের

কাছে। তা'রা ডুবে গেছে রাত্রির মধ্যে, হারিয়ে গেছে এই অন্ধকারে। রাত্রির গভীর সত্তা তারায়-তারায় কথা কয়ে' উঠ্‌ছে—তা'র বেশি কিছু নয়।

আকাশে তারারা জায়গা অদল-বদল কর্‌ছে; মহাশূন্যে পৃথিবী তা'র সূর্য্য-প্রদক্ষিণে কয়েক সহস্র মাইল এগিয়ে গেলো। সহস্রবার স্পন্দিত হ'লো তাদের হৃৎপিণ্ড—পার্থপ্রতিমের আর শ্রীলতার। দ্রুত, উচ্চ স্পন্দন। যেন ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ছে প্রতি মুহূর্ত্তের প্রস্থান। যে-অদৃশ্য তারার আলো এখনো পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি, তা আরো কয়েক কোটি মাইল অগ্রসর হ'য়ে এলো।

তারপর শ্রীলতা জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'রাত কি অনেক হ'লো?'

পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।'

'আমার হাতে একটা ঘড়ি ছিলো—দেখা যাচ্ছে না কিছুই।'

'সময় থেমে গেছে।'

আবার দু'জনে চুপ।

'যাওয়া যাক্ এবার', শ্রীলতা চেষ্টা করে' বলে' উঠ্‌লো।

'চলুন।'

'আমাকে একটুখানি এগিয়ে দেবেন ?'

'ভয় কেন ?'

'না, ভয় নয়।'

আরো খানিকক্ষণ গেলো।

'কই, উঠুন।'

'আপনিও তো বসে' আছেন।'

'এবার যেতেই হয়।' কিন্তু শ্রীলতা উঠ্‌লো না; পার্থপ্রতিমও বসে' রইলো। তারা থেকে তারায় ইসারা ঝল্‌সে যেতে লাগ্‌লো।

'নাঃ, এবার সত্যি—'

'আমি তো প্রস্তুত।'

'কই, আপনি তো বসে'ই আছেন।'

'আপনিও তো তা-ই।'

দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠ্‌লো।

'অসম্ভব!'

'আর-একটু বস্‌লেই তো হয়।'

'পাগল! আমার ভয় হচ্ছে, একটু পরেই বুঝি ভোর হ'য়ে যাবে।'

'হ'লোই বা।'

শ্রীলতার মৃদু হাসির স্বর শোনা গেলো।—'এমন কর্‌লে কি চলে! উঠুন্ না।'

'এই তো উঠ্ছি।' পার্থপ্রতিমের শরীর একটু নড়ে' উঠ্লো।

'কী হ'লো?'

'জুতোটা কোথায় খুলে রেখেছি, খুঁজে পাচ্ছি নে।'

'বুঝ্তে পেরেছি—'

'এই—এক মিনিট।'

শেষটায় তা'রা দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো। 'কোন্-দিকে আপনার বাড়ি?' পার্থপ্রতিম জিজ্ঞেস কর্লে।

'চলুন।'

আকাশ-ভরা তারার তলা দিয়ে প্রায় দু'মাইল তা'রা অতিক্রম কর্লে। সারা পথ কেউ কোনো কথা বল্লে না।

তারপর শ্রীলতা হঠাৎ থম্কে দাঁড়ালো। বল্লে, 'ঐ যে।' একটু দূরে লম্বা, একতলা বাঙ্লোধরণের একটা বাড়ি অস্পষ্ট দেখা গেলো। একটা জান্লায় আলো জ্বল্ছে।

'ওঁরা বোধ হয় ফিরেছেন,' শ্রীলতা বল্লে।

'আমার আর আস্বার দরকার নেই বোধ হয়?'

'না।—শুনুন্, একটা কথা মনে রাখ্বেন। আপনি আমাদের বাড়িতে কখনো আস্তে পার্বেন না।'

'বুঝেছি।'

'এখন যান্।—কাল—সেখানেই।'

'আচ্ছা।—ঘুমের আগে একবার মনে কর্‌বেন আমার কথা।'

শ্রীলতা অস্ফুটস্বরে কী বল্‌লে, বোঝা গেলো না। তারপর দ্রুতপথে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লো বাড়ির দিকে। পার্থপ্রতিম তা'র দিকে তাকিয়ে রইলো, অন্ধকারে ছায়ামূর্ত্তির মত, নিঃশব্দ-সঞ্চারে কাঠের নিচু ফটকের হুড়্‌কো তুলে বাড়ির বাগানে ঢুক্‌ছে। একটু পরে বাড়ির অভ্যন্তর তা'কে গ্রাস করে' ফেল্‌লে।

'বৌদি, তোমরা কখন্ ফির্‌লে?' মাঝখানকার বস্‌বার ঘরটায় ঢুক্‌তে-ঢুক্‌তে প্রফুল্ল উচ্চস্বরে শ্রীলতা বলে' উঠ্‌লো।

'এই তো খানিকক্ষণ,' লেডীজ্ হোম্ জর্নালের পৃষ্ঠা থেকে চোখ তুলে মানসী বল্‌লেন।

'তারপর—তা'কে পেয়েছিলে, যা'র সঙ্গে গিয়েছিলে দেখা কর্‌তে?' শ্রীলতা ঘরের মধ্যে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

'হ্যাঁ, আমাদের জন্যে সে অপেক্ষাই কর্‌ছিলো।'

'খুব এঞ্জয় করলে, আশা করি?'

'মন্দ নয়। তোমার কথা জিজ্ঞেস কর্‌ছিলো ওরা। তুমি গেলে না—'

'ওঃ, বৌদি—কী রাত্রি! বাইরে কী রাত্রি! একবার তাকাও বাইরে। এমন রাত্রি কি হোটেলের ঘরে বসে' ভদ্র আলাপ কর্‌বার জন্য? এই রাত্রিতে আমি ভরে' গেছি।' শ্রীলতা তা'র মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে একটু ঝাঁকুনি দিলে। 'বৌদি, বিছানায় শুয়ে খোলা জান্‌লা দিয়ে একবার চোখ মেলে দিয়ো।' শ্রীলতা চেয়ারের হাতলের উপর আল্‌গোছে একটু বস্‌লো, 'একটা গান কর্‌বে, বৌদি?'

'হ'লো কী তোমার?' মানসী তা'র চোখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, 'খাবার এদিকে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।'

'ওঃ, নিশ্চয়ই! খিদেয় স্রেফ মারা যাচ্ছি। তোমরা বসে' ছিলে বুঝি আমার জন্য? চলো।' শ্রীলতা সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো, 'এক মিনিট—কাপড়টা বদ্‌লে আস্‌ছি। একটা গান কিন্তু শোনাবে। আমি কেন গাইতে পারি নে? তোমাকে ভীষণ হিংসে হচ্ছে, বৌদি—আমি যদি একটুও গাইতে পার্‌তুম!—একটু বোসো তোমরা।' লঘু, দ্রুত পা ফেলে শ্রীলতা সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

নিজের ঘরে, কাপড়টা বদ্‌লে নিয়ে সে আয়নার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ালো। 'কাল,' অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে

কে উচ্চারণ কর্‌লে, 'কাল।' আয়নার ছায়ার ঠোঁট নড়ে' উঠ্‌লো। শ্রীলতা তাকিয়ে রইলো, যেন সে এমন কাউকে দেখ্‌ছে, যা'কে আগে কখনো ছাখে নি। গোলাপি আভায় আপ্লুত তা'র মুখ, এ কী আশ্চর্য্য দীপ্তি তা'র চোখে। এই রাত্রি, মনে-মনে সে বল্‌লে, এই রাত্রি রয়েছে আমার মধ্যে, আর তা-ই উপ্‌চে পড়্‌ছে আমার শরীর দিয়ে এত লাবণ্য হ'য়ে। কিন্তু কে জান্‌তো এত সুন্দর হবার ক্ষমতা তা'র আছে!

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হোটেলের দিকে যেতে-যেতে পার্থপ্রতিমের মনে হ'তে লাগ্‌লো যেন এইমাত্র রাত্রিতে একটা নতুন অনুভূতি লেগেছে, নতুন-কোনো চেতনায় ছেয়ে গেছে আকাশ। কিছুই বৃথা নয়, অর্থহীন নয়; সমস্ত বিশ্ব বাণীময়, সেই বাণী বেজে উঠ্‌ছে অন্ধকারের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। এই অতল অন্ধকার আর তারা-ভরা আকাশ নিয়ে রাত্রি কিসের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হ'য়ে আছে। সম্মোহিতের মত, পার্থপ্রতিম চল্‌তে লাগ্‌লো। হঠাৎ এক সময়ে তা'র যেন মনে হ'লো, এতক্ষণে তা'র যেখানটায় আসা উচিত, সেখানে সে আসে নি। সে ভালো করে' চারদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে—না, জায়গাটা অনভ্যস্ত ঠেক্‌ছে চোখে। আরো খানিকদূর এগিয়ে সে বুঝতে পার্‌লে যে সে পথ ভুল করেছে। কিন্তু

সে গ্রাহ্য করলে না : আন্দাজি এক রাস্তা ধরে' হাঁটতে আরম্ভ করলে। ফেরবার কোনো তাড়া নেই। তা'র পা একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো, কিন্তু সেটা কিছু নয়; এই রাত্রির মধ্যে মগ্ন হ'য়ে গিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়ানো—তা'র মত আর কী? নিজকে সে সম্পূর্ণ-রূপে সমর্পণ করলে রাত্রির হাতে—এই নতুন রাত্রি, নতুন প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস। চুপ করো, চুপ করো, নিজের উদ্দেশে বার-বার সে বলতে লাগলো, রাত্রিকে কথা কইতে দাও, রাত্রি কথা কয়ে' উঠুক্ তোমার মধ্যে। সে খেয়াল করলে না, কোন্দিকে যাচ্ছে; অনেক রাস্তা ঘুরে-ঘুরে, অনেক বালি ডিঙিয়ে, শরীর-ভরা ক্লান্তি নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত যখন হোটেলে পৌঁছলো রাত তখন এগারোটা, হোটেলের অনেকেই পড়েছে ঘুমিয়ে, সাম্নের বারান্দায় অনেক কসরৎ করে' লণ্ঠন বাঁচিয়ে এক দল ব্রিজ খেলছে; আর উপরে ওঠবার সিঁড়ির মাথায় একটা চাকর দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছিলো, তা'র পায়ের শব্দ শুনেই ধড়মড় করে' উঠে দাঁড়িয়ে চোখ কচলাতে-কচলাতে জিজ্ঞেস করলে, 'বাবুর জন্যে কী খাবার দেবো? লুচি না ভাত?'

‘ভাবনা কাহারে বলে ?’

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শ্রীলতার মনে হ’লো, এখনই কেন সন্ধ্যা হ’লো না ? সমস্তটা দিন তা’র পক্ষে হ’য়ে উঠ্‌লো সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা। ঘণ্টাগুলো কেটে যেতে লাগ্‌লো একটা মোহের মধ্যে। প্রাত্যহিক যা-কিছু কর্ত্তব্য—স্নান আর আহার, টুক্‌রো-টুক্‌রো কথাবার্ত্তা বলা, এমন অপর্য্যাপ্ত ওজোন-সেবনে কা’র স্বাস্থ্যের কতখানি এবং কী-রকম উন্নতি হচ্ছে, এ-হারে কালো হ’তে থাক্‌লে সূর্য্যের ছায়াময় বার্নিশ কত গভীর হবে তাদের চাম্‌ড়ায়, এ নিয়ে আলোচনা—সবই সে করে’ গেলো ; কিন্তু সব সময়, তা’র জীবন যেন বয়ে’ যাচ্ছে অন্য-কোনো স্তরে, কোনো গোপন সুর বেজে বেজে চলেছে প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি মুহূর্ত্তের মৃত্যুতে অস্ফুট রহস্য-স্বর। শ্রীলতা নিজেই অবাক হ’য়ে গেলো। এমন যে হ’তে পারে, সে কখনো ভাবে নি। সে এতদিন বেঁচেছে বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে’ ; ‘আমি বুঝ্‌তে পারি,’ এই ছিলো তা’র পক্ষে চরম গর্ব্বের কথা। মিথ্যা, মিথ্যা—গরম দুপুরবেলায় ঘরের সব

ক'টা জানলা খুলে দিয়ে তেতে-ওটা হাওয়ার মধ্যে বসে' সে ভাবতে লাগলো—কিছুই বোঝা যায় না। কিছুই বোঝা যায় না; শুধু ইচ্ছে করে চোখ মেলে, তাকিয়ে থাকতে, চুপ করে' বসে' দীর্ঘ, উষ্ণ ঘণ্টাগুলো কাটিয়ে দিতে। এ কী মায়া আচ্ছন্ন করেছে তা'কে; তা'র জীবন এমন করে' জাহু করলে কে? এই যে সে তা'র পায়ের আঙুলগুলে বাঁকাচ্ছে আর খুলছে এই যে তা'র হাত অলসভাবে পড়ে' আছে কোলের উপর, এই যে মাঝে-মাঝে তা'র চোখ জড়িয়ে আসছে যেন আলোয় ক্লান্ত হ'য়ে—এরি মধ্যে উপচে পড়ছে এত সুধা। বেঁচে এতও সুখ আছে। কেন আমরা ছট্‌ফট্‌ করি, ঝগড়া করি, মস্ত-কিছু করতে চাই—কেন আমরা ক র্ তে চাই? এই হওয়াই তো চরম সুখ: আর-কিছু নয়—শুধু এই উত্তাপে-আলোকে পরিপ্লুত ত্বপুরবেলাকার আলস্যের সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়া। এই তো যথেষ্ট—আকাশ-ভরা এই আলো, এই সুন্দর শরীর—আর স্তব্ধ,, স্তব্ধ হ'য়ে বসে' চারদিককার বিশ্বকে অজ্ঞাতে নিজের মধ্যে শোষণ করে' নেয়া।

বৌদির কাছে তা'র প্রতিজ্ঞার কথা শ্রীলতার মনে পড়লো। তিনি এখন কী বলবেন—যদি জানতে পারেন? হয়-তো, শেষ-পর্য্যন্ত, খুব অবাক তিনি হবেন

না। এ-রকম যে হ'তে পারে, তিনি তা জেনেই থাক্‌বেন; সেইজন্যই নিজে রইচ্ছাকে তিনি খাটাতে চেয়েছিলেন অত জোর করে', অমন তীব্রভাবে। প্রবল তাঁর গর্ব্ব, সেই গর্ব্ব ফেনিয়ে উঠেছিলো হিংস্রতায়। আর—তা'র নিজের মনেও তো গর্ব্ব ছিলো, সেই গর্ব্বে সে নিজকে আঘাত দিয়েছিলো এবং অন্যকে। তা'রা দু'জনেই দু'জনকে আঘাত করেছিলো তা'দের গর্ব্বে। কী অন্ধতা! আজ অপসৃত হলো সে-অন্ধকার: আলো উঠেছে জ্বলে' মন থেকে মনে। এতদিন তা'রা কী ক'রে' থাক্‌তে পেরেছিলো?

বিকেলে চায়ের পরে শ্রীলতা তা'র ঘরে ঢুক্‌লো সাজসজ্জা কর্‌তে। বাক্স থেকে এক স্তূপ শাড়ি বা'র করে' সে চুপ করে' তাদের দিকে তাকিয়ে বসে' রইলো। কোনো তাড়া নেই; সন্ধে হ'তে এখনো দেরি। একটা শাড়িও তা'র ঠিক পছন্দ হচ্ছিলো না। স্তূপের ভিতর থেকে জম্‌কালো একটা আঁচলের একটুখানি বেরিয়ে ছিলো; সে দু' আঙুল দিয়ে তা লঘুভাবে স্পর্শ কর্‌লে। নরম রেশম আদর কর্‌লো তা'র আঙুলকে। তবু যেন যথেষ্ট নরম নয়, যথেষ্ট সুন্দর নয়।

শ্রীলতা উঠে গিয়ে আয়নার ধারে বস্‌লো। খুলে দিলে তা'র অজস্র কালো চুল পিঠের উপর। দুটো

মোটা গোছায় ভাগ করে' তা'র বুকের উপর এনে ফেল্‌লো। একটা দীর্ঘ, মসৃণ চুল আলগোছে আলাদা করে' নিয়ে জড়াতে লাগ্‌লো তা'র আঙুলে। টুক্‌টুকে হ'য়ে উঠ্‌লো আঙুলের বৃন্ত। আরো জোরে কষ্‌তে গিয়ে ক্ষীণ শব্দ করে' চুলটা মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে গেলো। সে কী কর্‌ছে? চুলটা অন্তত বেঁধে ফেলা যাক্‌। চিরুনি তুলে নিয়ে সে আয়নায় তাকালো। খানিকক্ষণ তাকিয়েই রইলো, চিরুনিটা তা'র কপালের কাছে অপেক্ষমান। 'তোমাকে আজ বড় বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে, শ্রীলতা', মৃদুস্বরে সে বল্‌লে। কী করে' সে নিজকে গোপন কর্‌বে—তা'র সমস্ত শরীর যে তা'কে ধরিয়ে দিচ্ছে। তা'র দিকে তাকালেই যে বোঝা যাবে। এত সুন্দর হওয়া যেন খানিকটা লজ্জাকর, তা নগ্নতার মত। কাউকে এমন উন্মুক্ত করে' দেখাবার অধিকার কারো শরীরের নেই। মানসীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শ্রীলতার মনে পড়্‌লো—কিছু কি পড়্‌বে তাঁর চোখে? তিনি কি কোনো বাঁকা প্রশ্ন কর্‌বেন? শ্রীলতার হাত নড়ে' উঠ্‌লো, চিরুনিটা লাগ্‌লো এসে চুলের উপর। তা'র ডান হাত চুলের গোড়া থেকে প্রান্ত পর্য্যন্ত অর্দ্ধ-চক্র রচনা করে' যাচ্ছে। সে মুগ্ধ হ'য়ে গেলো হাতের সেই ভঙ্গী দেখে। কী সুন্দর এই শরীর—কী স্বচ্ছন্দ তা'র

ব্যবহারে, কী শ্রীময় তা'র লীলায়। সাবধানে, সযত্নে, শ্রীলতা তা'র চুল ঠিক মাঝখান দিয়ে ভাগ কর্‌লে। তারপর কী কর্‌তে হবে, তা যেন সে ভুলে গেলো; খানিকক্ষণ খামকা বসে' রইলো অলস হ'য়ে; টের পেলে না, সময় যেতে লাগ্‌লো কী করে'।

সবসুদ্ধ সে প্রায় এক ঘণ্টা সময় নিলে। আর দেরি নেই, শ্রীলতা বারান্দায় বেরিয়ে এলো। নাম্‌লো বাগানে। সেখানে মানসীর সঙ্গে দেখা।

'বৌদি, তোমরা আজ আর বেরোবে না বুঝি?'

'একটু পরেই বেরুবো। এখনো তো রোদ'

'রোদই তো ভালো—এই বিকেলের রোদ। আমি দেরি কর্‌তে পারি নে—চল্‌লুম।'

'কোন্‌দিকে যাচ্ছো?'

'কোথায় যেন এক ঝুড়ি রঙিন ঝিনুক দেখেছিলুম কালকে। যদি খুঁজে বা'র কর্‌তে পারি, নিয়ে আস্‌বো।'

'কী হবে ও দিয়ে?'

'কী হবে? কী দিয়েই বা কী হয়।'

'ছেলেমান্‌ষি!'

'তবে না আন্‌লুম। ঝিনুক ছড়াতে-ছড়াতে আস্‌বো সারাপথ—যদি কেউ আমার পিছন-পিছন আসে, তা'র জন্য রেখে দেবো চিহ্ন।' শ্রীলতা হেসে উঠ্‌লো।

মানসী তা'র মুখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন। তারপর বল্‌লেন, 'এত খুসি কেন তোমার?'

'বৌদি, এত ভালো লাগে।'

'হঠাৎ এত ভালো লাগ্‌বার কী পেলে তুমি?'

'কী? কী নয়? সব—সব। এত ভালো লাগে, বৌদি, যে ভয় হয় পাছে মরে' যাই।' বল্‌তে-বল্‌তে, হাস্‌তে-হাস্‌তে শ্রীলতা বাগান পার হ'য়ে রাস্তায় এসে পড়্‌লো।

বাগানে ছায়া

স্বপ্নের মত কেটে গেলো কয়েকটা দিন। তারপর পার্থপ্রতিম আবিষ্কার করলে, তা'র টাকা ফুরিয়ে এসেছে। তা'র জীবনে বল্‌তে গেলে প্রথম বার, সে আক্ষেপ করলে, তা'র আরো টাকা নেই বলে'। একজন যেমন খুসি করতে পারে না কেন? আজকালকার দিনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রবল জনশ্রুতি শোনা যাচ্ছে। আমরা নাকি কেউ কারো হুকুম তামিল করবার জন্য সৃষ্ট হই নি: আমরা মুক্ত। এই মুক্তি নিয়ে আমরা ঝগ্‌ড়া করি, মারামারি করি: আমরা বিশ্বাস করি তা'তে।

মধুর, মধুর বিশ্বাস! তেম্‌নি, কোনো সময়ে আমরা বিশ্বাস কর্‌তুম এ-জন্মের দুঃখের জন্মান্তরে প্রচুর ক্ষতি-পূরণে। সব চেয়ে সহজ হচ্ছে বিশ্বাস করা। আইন বাঁচিয়ে, আমাদের কাল সম্বন্ধে যথোচিত গর্ব্ব নিয়ে আমরা বলাবলি করছি, কি কায়দা করে'—যা, শেষ পর্য্যন্ত একই কথা—আইনকে ফাঁকি দিয়ে আমরা যা-খুসি তা-ই কর্‌তে পারি। হ্যাঁ, সবই পারি, পার্থ-প্রতিম মনে-মনে বল্‌লে, কেবল, সম্প্রতি, পারি নে আর দুটো দিন পুরীতে থাক্‌তে। অবিশ্যি আমাকে বাধা দেবার কেউ নেই; আমার যতদিন ইচ্ছে এখানে থাক্‌তে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত টাকা যে-দুর্জ্ঞেয়, দুর্নিরীক্ষ্য প্রণালীতে বিতরিত হচ্ছে, তা'তে আমার অংশে ঠিক সেইটুকু পড়েছে, যা'তে এর বেশি একটি দিনও থাক্‌তে গেলে আমাকে সাম্‌নের মাসের অন্নসংস্থানের উপর জুলুম কর্‌তে হবে। এই পর্য্যন্ত, আমার স্বাধীনতা। কিন্তু প্রতিবাদ করা, আক্ষেপ করা বৃথা: তা'তে মোটামুটি ব্যাপারটা আরো খারাপ হ'য়ে উঠ্‌বে মাত্র। একজন যে-সময়ে জন্মেছে, তা'র বিধান নিতেই হবে মেনে। সহ্য যখন কর্‌তেই হবে, সব চেয়ে ভালো হচ্ছে হাসিখুসিভাবে সহ্য কর্‌বার চেষ্টা করা—নিদেন, সে-ভাণ করা।

সে-সন্ধ্যায় সমুদ্রের পাড় ধরে' হাঁট্‌তে-হাঁট্‌তে তা'রা কোথায় যে চলে' এলো—মনে হয়, মানুষ এর আগে কখনো সেখানে আসে নি। সমুদ্রের শেষ নেই: শেষ নেই এই বালু-বন্ধ্যা পীত-ধূসর প্রসারের। সবুজের আগুন একে স্পর্শ করে নি: শতাব্দীর পর শতাব্দী, এ যেন পড়ে' আছে প্রাণের প্রতীক্ষায়; এক বিশাল, আদিম ঔদাস্যে এ আচ্ছন্ন। রাত্রি নাম্‌লো।

তখন পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'কাল আমি চলে' যাচ্ছি।'

'কালই?'

এর পর তা'রা যে-সব কথা বল্‌লে, তা এখানে বল্‌বার মত নয়। বর্থ্‌ রিজার্ভ্‌ করা হয়েছে কিনা, গাড়িতে রাত্তিরে হয়-তো শীত কর্‌বে, পার্থপ্রতিম কি রেলগাড়িতে বই পড়্‌তে ভালোবাসে, কোনো সহযাত্রী আলাপে প্রবৃত্ত হ'লে কী করে' আত্ম-রক্ষা কর্‌তে হয়, ইত্যাদি। সন্ধের একটু পরেই তো গাড়ি—কাল হয়-তো তাদের আর দেখা কর্‌বার সুবিধে হবে না। তা'রা হঠাৎ উপলব্ধি কর্‌লে যে এই তাদের শেষ দেখা—কিছু সময়ের জন্য। সঙ্গে-সঙ্গে তা'রা দু'জনেই একটু অস্বস্তি বোধ কর্‌তে লাগ্‌লো, তাদের যেন মনে হ'লো কিছুই আর বল্‌বার নেই। এখন ছাড়াছাড়ি হ'লেই যেন বাঁচা যায়। এ আর বহন করা যাচ্ছে না, এই

পরস্পর-চেতনার ভার, একের মনের উপর অন্যের এই পেষণ।

ফের্‌বার সময় অনেকটা পথ তা'রা চুপচাপ এলো। তারপর, যেখানে তাদের দু'জনের রাস্তা গেছে দুদিকে, সেখানে এসে তা'রা একটু দাঁড়ালো। 'আজ খুব শিগ্‌গিরই ফেরা হ'লো,' পার্থপ্রতিম বল্‌লে।

অন্ধকারে, শ্রীলতার হাত পার্থপ্রতিমের হাতের উপর এসে পড়্‌লো। একটু সময়, তা সেখানে পড়ে' রইলো, নরম আর উষ্ণ, উষ্ণ একটুখানি প্রাণের মত। এক টুক্‌রো উষ্ণ প্রাণ, সেই হাত। শান্ত, নরম একমুঠো আগুন। যে-আগুন তা'র রক্তে, যে-আগুনের আভা তা'র গোলাপি গালে, তা'র ঠোঁটের বাঁকা রেখায়। সেই আগুন, পার্থপ্রতিম অনুভব কর্‌লে, অসংখ্য সূক্ষ্ম স্রোতে সঞ্চারিত হচ্ছে তা'র শরীরের কোষে-কোষে। প্রদীপ থেকে জ্বলে' উঠ্‌ছে প্রদীপ। সেই ছোট, নরম হাতের চাপে পার্থপ্রতিম যেন চূর্ণ হ'য়ে যেতে লাগ্‌লো।

তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে শ্রীলতা বল্‌লে, 'যাই'; বলে'ই তা'র রাস্তা ধরে' হাঁট্‌তে আরম্ভ কর্‌লে দ্রুত পায়ে।

আর সেই রাত্রে, তন্দ্রার মাঝখানে, পার্থপ্রতিম যেন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠ্‌লো। রাত তখন কত? কোনো ইসারা নেই। সমুদ্র কী কইতে চাইছে

স্পষ্ট করে', বাতাসে হু-হু করে' উঠ্ছে যেন কা'র চাপা কান্না। পার্থপ্রতিম বিছানার উপর উঠে বস্লো; কান পেতে শুন্লো খানিকক্ষণ। ঘরের মধ্যে অস্পষ্টতা; দীর্ঘ, অনিয়মিত নিঃশ্বাস—সবাই ঘুমুচ্ছে ক্লান্ত হ'য়ে। সে কী করছে, তা ভালো করে' বুঝ্তে না পেরেই পার্থপ্রতিম বিছানা থেকে নাম্লো; দেয়ালের ব্র্যাকেট থেকে তুলে নিয়ে পর্লে একটা জামা। রাত্রি তা'কে ডাক্ছে বাইরে, সে চলেছে স্বপ্নের মধ্যে।

বাইরে, তারায়-তারায় তীক্ষ্ণ রাত্রির স্পর্শে তা'র শরীর অণুতে-অণুতে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্লো। অন্ধকার দু'দিকে সরে'-সরে' যেতে লাগ্লো তা'কে পথ করে' দিতে। কত বালি সে ডিঙোলে, কত মোড় সে ঘুর্লো, কত ঘুম সে পার হ'য়ে এলো—কিছুই সে টের পেলো না।

খোলা জান্লার ধারে টেবিলে বসে' শ্রীলতা পড়্ছিলো—কিছু-একটা কর্তে হবে বলে'। কিছু তা'কে কর্তেই হবে: ভয়, বিছানায় শুয়ে যদি ঘুম না আসে। এত রাত হ'লো—একটুও কি ঘুম পেতে নেই? বই তা'র আর ভালো লাগ্ছিলো না। সে ভালো করে' মনে আন্তে পার্ছিলো না, এর আগে সে কখনো ঘুমিয়েছে কিনা। খোলা বই ফেলে' রেখে সে উঠে

দাঁড়ালো গিয়ে জান্‌লার ধারে। জান্‌লাটা খুব নিচু : চৌকো আলো অন্ধকার বাগানের অনেক দূর গিয়ে পড়েছে। হঠাৎ শ্রীলতার মনে হ'লো যেন একটা অস্পষ্ট মূর্ত্তি সেই চৌকো থেকে সরে' গেলো ছায়ায়।

'কে ? কে ওখানে ?' শ্রীলতার মুখ থেকে অস্ফুট চীৎকার নিঃসৃত হ'লো।

মুহূর্ত্ত পরে পরিপূর্ণ আলোয় দেখা গেলো একজনকে। 'তুমি !' বল্‌তে শ্রীলতার স্বর যেন ভেঙে পড়্‌লো।

'ধরা পড়ে' গেলুম', পার্থপ্রতিম বল্‌লে, 'ভেবেছিলুম লুকিয়ে তোমাকে দেখে যাবো। যাই।'

'না', শ্রীলতা বল্‌লে, 'যেয়ো না। এসো। ওদিক দিয়ে দরজা। এসো। বেশি শব্দ কোরো না।'

শ্রীলতা গিয়ে দরজাটা খুলে দিলে। যেন বাইরের সমস্ত রাত্রি নিয়ে পার্থপ্রতিম ঢুক্‌লো। 'কেন এসেছো ?' শ্রীলতা জিজ্ঞেস কর্‌লে।

'তোমাকে দেখ্‌তে দাও, শ্রীলতা।'

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?'

'অন্ধকারে বাঘের চোখের মত তোমার চোখ। তা'রা জ্বল্‌ছে।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে না, ঘুম পাচ্ছে না।'

'চোখ বোজো', পার্থপ্রতিম বল্‌লে।

'আমার চোখের মধ্যে রক্ত টিপ্‌টিপ্‌ কর্‌ছে।'

'রাত্রি দিয়ে চোখ ভরে' নাও।'

'তোমাকে যে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।'

'অন্ধকারকে হ'তে দাও তোমার মধ্যে।'

আর খানিকক্ষণ, রইলো কেবল অন্ধকার, সময়ের বুকের উপর স্পন্দিত।

তারপর শ্রীলতা বল্‌লে, 'তুমি যাও।'

'তুমিও চলো', পার্থপ্রতিম বল্‌লে।

'যাও, আর দেরি কোরো না', শ্রীলতার কণ্ঠস্বর আর-একবার ভেঙে পড়্‌লো।

'চলো, তুমিও চলো।'

'আ', শ্রীলতা বল্‌লে, 'আমিও আস্‌বো।'

'তুমি কোথায়? তুমি কোথায়?' পার্থপ্রতিম বলে' উঠ্‌লো।

'ভয় কোরো না। তুমি যাও।'

আর, শ্রীলতার মুখের কথা শেষ হ'তে-না-হ'তে পার্থপ্রতিম বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। আলো নিবিয়ে দিয়ে শ্রীলতা শুয়ে পড়্‌লো। খানিকক্ষণ সে রইলো স্তব্ধ, স্তব্ধ হ'য়ে—যেন তা'র নিঃশ্বাস পড়্‌বে না। তারপর তা'র দুই চোখ ছাপিয়ে জল এসে পড়্‌লো।

অতিরিক্ত

কল্‌কাতায় ফের্‌বার সপ্তাহখানেক পর পার্থপ্রতিম এই চিঠি পেলো :

'কাল ফিরেছি কল্‌কাতায়। একাই। একটা মেয়ে-কলেজে চাক্‌রির জন্য লিখেছিলুম, তা'রা ডেকে পাঠিয়েছে। দেখা কর্‌লুম তাদের সঙ্গে। চাক্‌রিটা এখন আমার—চাইলে পরেই। দাদাকে লিখে দিলুম চিঠি। সঙ্গে বৌদিকে এক লাইন: "যা-ই বলো না, বৌদি, মাষ্টারিগিরির চাইতেও সাংঘাতিক কাজ মানুষ করেছে—ইতিহাসে তা'র ছড়াছড়ি। এবং ভবিষ্যতে আরো কর্‌বে, সন্দেহ নেই। মাঝখান থেকে হাতের এত কাছে এসে আমার চাক্‌রিটা ফস্‌কায় কেন?" বৌদি বুঝ্‌তে পারেন না, রোজ যথেষ্ট খেতে পেলেও একজন কোনো কাজ কর্‌তে চাইবে কেন? তাঁকে দেখে-দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে যাই; তিনি হচ্ছেন যাকে বলা যেতে পারে স্বভাবতই রাজকন্যা।

'আমার ইচ্ছে ছিলো, কল্‌কাতার বাইরে কোনো কাজ নিয়ে যাই; কিন্তু এখন এটার উপরই ভীষণ

লাভ হচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে, তা ছাড়া, কল্‌কাতার বাইরে যাবার তেমন তাগিদও পাচ্ছি নে মনে।

'এখন আর আমাদের মাঝখানে কোনো বাধা নেই: জীবন অবারিত, অবাধ মুক্তি চারদিকে। এখন শুধু দু'হাত ভরে' জীবনকে নেয়া—আর-কিছু নয়।

'তোমার সঙ্গে কবে দেখা হ'তে পারে?

শ্রীলতা।'

পার্থপ্রতিম লিখ্‌লে উত্তরে:

'দেখা হ'তে পারে যেদিন তুমি চাও। তাড়া নেই তা'র। কিন্তু তা'র আগে একটা কথা তোমাকে বলি। এ-কথা কেন লিখেছো, "এখন আর আমাদের মাঝ-কোনো বাধা নেই?" এখন—মানে, তুমি কলেজে কাজ নিয়েছো বলে'? তুমি যা, তুমি তো তা-ই; কী এসে যায় অন্য-কিছুতে? এম্‌নিতে কি কোনো বাধা থাক্‌তো? তোমার জন্যেই তো আমার ভাবনা: সংসারে তোমার যা পরিচয়, তা'র জন্যে নয়। তোমার পরিচয় আমি পেয়েছি নিজের মধ্যে। তোমার যদি এক পয়সাও না থাক্‌তো, আমি কোনোখান থেকে ধার করে' আন্‌তুম তোমার জন্য। তোমার যদি লাখ টাকা থাক্‌তো, দু'হাতে তা ওড়াতুম মনের খুসিতে।

'কিন্তু ও-সব কথা ওঠেই না। আসল কথাটা হচ্ছে—সে তো তুমিই বলেছো। এখন যেন আমরা ভয় না করি: আমরা যেন হ'তে পারি—তুমি আর আমি, জীবনের আতঙ্ক আর রহস্যের মধ্যে।

'তোমার কথা শুন্‌তে আশা কর্‌বো।

পার্থপ্রতিম।'

শ্রীলতা আবার লিখ্‌লে:

'আমার কথা? আমি একদিন মনে-মনে ভেবেছিলুম, যে-গর্ব্বে তুমি আমাকে অস্বীকার কর্‌লে, সেই-খানে আমি তোমাকে ছোট কর্‌বো। সেটা ছিলো আমার গর্ব্ব। তা আজ তৃপ্ত হয়েছে; কিন্তু এখন আর তা'র কোনো অর্থ হয় না আমার কাছে। তা না হ'লেও একই কথা হ'তো। আমার সে-গর্ব্ব তুমি নিয়েছো; এইবার আমাকে তুমি নাও।

শ্রীলতা।'